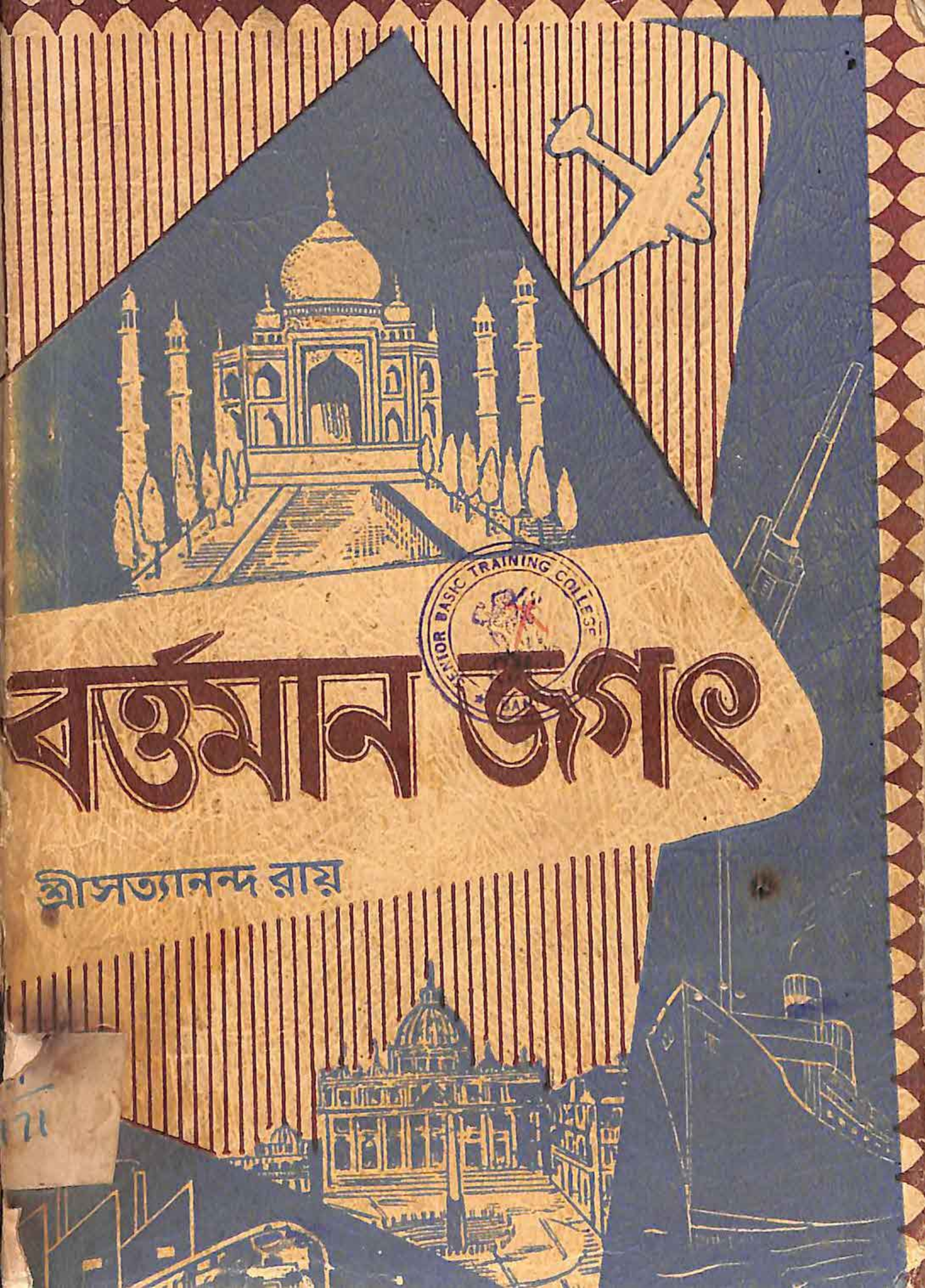
বর্ত্তমান জগৎ

শ্রীসত্যানন্দ রায়



পশ্চিমবঙ্গ মধ্য-শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে অনুমোদিত
নোটিফিকেশন নং (Syl. 68/55. তারিখ ১৯।১০।৫৫

বর্ত্তমান জগৎ

[অষ্টম শ্রেণীর জন্য লিখিত]

শ্রীসত্যানন্দ রায় এম, এ,
ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ,
কলিকাতা

দি গ্লোব লাইব্রেরী
২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রকাশক :—
বি, মল্লিক
দি গ্লোব লাইব্রেরী
২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—১৯৫৫
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৫৫

মুদ্রাকর :—
শ্রীনরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী
স্বপ্না প্রেস লিঃ
৮/১, লালবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১

সূচীপত্র

বর্ত্তমান জগৎ

প্রথম অধ্যায়

ইউরোপে নবজাগরণ ও ধর্ম্ম সংস্কার

অতি প্রাচীন কালে যখন প্রথম নদী-মাতৃক সভ্যতা গড়িয়া উঠে সেই সময় হইতে মানুষ সভ্যতার পথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে এবং যুগে যুগে মানুষের সমাজ-চেতনা, রাষ্ট্র-চেতনা, ধর্ম্ম-চিন্তা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নানা পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। এই সকল পরিবর্ত্তনের কথা আমরা বিভিন্ন যুগের ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি। মধ্যযুগের ইউরোপে মানুষের চিন্তাধারা ছিল সঙ্কীর্ণ। স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার ও চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিবার সাহস তাহাদের ছিল না। তাহারা অন্ধ সংস্কারের বশীভূত হইয়া ধর্ম্মের শাসন মানিয়া চলিত। অন্ধ বিশ্বাস, ধর্ম্মের শাসন ও শিক্ষার সঙ্কীর্ণতা তাহাদের মন ও চিন্তাশক্তিকে জগদ্দল পাথরের মত পিষিয়া রাখিয়াছিল। যে শক্তি অতীতের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস ও শিক্ষার সঙ্কীর্ণতা ভাঙ্গিয়া দিয়া ইউরোপীয়দের মনে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছিল তাহাকে 'রেনেসাঁ' বা নবজাগরণ বলা হয়।

নবজাগরণ

রেনেসাঁ শব্দের অর্থ হইতেছে পুনর্জন্ম। কিন্তু ইতিহাসে ইহাদ্বারা মধ্যযুগের অবস্থাকে পরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করিয়া দেওয়া বুঝায়। গ্রীস ও রোমই ছিল ইউরোপীয় সভ্যতার আদিভূমি।

এই দুই প্রাচীন সভ্যদেশের মনীষীগণ সাহিত্য, দর্শন, কলা ও বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে স্বাধীন চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার তাঁহাদেরই লিখিত গ্রন্থে রাখিয়া গিয়াছিলেন। বর্ব্বর আক্রমণের ফলে ইউরোপীয়গণ ক্রমে এই সকল প্রাচীন মনীষীদের কথা একেবারে ভুলিয়া যায়। রেনেসাঁ ইউরোপীয়দের মনে এই সকল প্রাচীন গ্রীক ও রোমান মনীষীদের লিখিত অমূল্য গ্রন্থগুলি পাঠ করিবার আগ্রহ পুনরায় জাগাইয়া তোলে। ইহার ফলে ইউরোপের সর্ব্বত্র জ্ঞানের নূতন আলো ছড়াইয়া পড়িল। জ্ঞান বৃদ্ধির এই আন্দোলন মানুষের মনে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি আনিয়া দিল। অন্ধ বিশ্বাসের স্থলে আসিল যুক্তি ও অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি। কোন বিষয় পুরাতন বলিয়াই মানুষ আর তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে জিজ্ঞাসু হইয়া উঠিল। এতকাল ধর্ম্মের শাসনে তাহারা এ জীবনটাকে নশ্বর বলিয়া মনে করিয়াছে। মৃত্যুর পর স্বর্গসুখের আশায় তাহারা বর্ত্তমান জীবনকে উপেক্ষা করিত। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের জ্ঞান ও বিদ্যার পুনঃপ্রবর্ত্তনের ফলে নূতন আনন্দ এবং নূতন সুখভোগের ইচ্ছা তাহাদের মনে জাগিয়া উঠিল।

এই নবজাগরণকে ঐতিহাসিকেরা মধ্যযুগ ও বর্ত্তমান যুগের মধ্যস্থিত সীমারেখা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সকল সময়েই ইহা মনে রাখিতে হইবে যে ইতিহাসের গতি অবিচ্ছিন্ন। কোন নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা দিয়া ইহাকে ভাগ করা যায় না। কারণ যে পরিবর্ত্তন দ্বারা নূতন যুগের সৃষ্টি হয় সে পরিবর্ত্তন হঠাৎ আসে না। তাহা ঘটে ধীরে ধীরে—বহুকাল ধরিয়া। ভবিষ্যৎ যুগের বীজ বর্ত্তমান যুগেই নিহিত থাকে। তথাপি প্রচলিত মতে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক কর্ত্তৃক

কনষ্টান্টিনোপল নগর অধিকারের সময় হইতেই এই পরিবর্ত্তনের সূচনা বলিয়া ধরা হয়।

মধ্য যুগেই ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তনের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইউরোপের অধিবাসীরা নিশ্চেষ্ট ছিল না। বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের জন্য তখনও বহু চেষ্টা করা হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা দ্বারা সত্য জানিবার জন্য লোকে আগ্রহশীল হইয়া উঠিতেছিল। প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তে নানাস্থানে বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যবিষয় এবং শিক্ষাপদ্ধতি ছিল অন্য প্রকার। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ও আইন শিক্ষা দেওয়া হইত, কিন্তু মূলগ্রন্থের বাহিরে অন্য কিছু শিক্ষা দেওয়া হইত না। মধ্যযুগের শেষভাগে জ্ঞানলাভের এই উদ্দীপনা হইতেই প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সহজ হইয়াছিল।

রেনেসাঁ বা নবজাগরণের উৎপত্তি হয় ইটালীতে। ইহার প্রথম স্পর্শ লাভ করিয়া ইটালী নবজীবনের পথে যাত্রা সুরু করে। ইটালী হইতে ইহা পশ্চিম ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। ইটালী ছিল নব-জাগরণের উপযুক্ত স্থান। মধ্যযুগের শেষভাগে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী দেশগুলিই ইউরোপে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। ইটালীর নগরগুলির অবস্থা তখন সর্ব্ববিষয়ে উন্নত ছিল। ক্রুসেডের সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা এই নগরগুলি অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রাচীন গ্রীস ও রোম যে সুন্দর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিল বহুকাল পর পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন তাহার দিকে নূতন করিয়া দৃষ্টি পড়িল তখন ইটালীর অধিবাসীরা সেই নূতন সৌন্দর্য্যকে জানিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিল। ইটালীর ধনদৌলতে ভরা নগরগুলি নূতন সাধনার বড়

বড় কেন্দ্রে পরিণত হইল। ইহাদের মধ্যে ফ্লোরেন্স, মিলান ও ভিনিসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইটালীতে এই নবজাগরণ যে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার দুইটি দিক ছিল। একটি হইল প্রাচীন সাহিত্য ও প্রাচীন শিক্ষার পুনঃপ্রবর্ত্তন এবং অপরটি হইল প্রাচীন কলাবিদ্যার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। পশ্চিম ইউরোপে প্রথমটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রাচীন সাহিত্য ও শিক্ষা পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে 'হিউম্যানিষ্ট' বা মানবতাবাদী বলা হইত। কারণ তাঁহারা মধ্যযুগের আধ্যাত্মিকতার পরিবর্ত্তে মানুষের ঐহিক জীবনের প্রতি বেশী অনুরাগী ছিলেন।

ইটালীতে মানবতাবাদীদের অগ্রণী ছিলেন পেট্রার্ক। সাহিত্যে যাঁহারা নূতন ভাবধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পেট্রার্ক ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। প্রাচীন সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষতা তিনিই সর্ব্বপ্রথম মনেপ্রাণে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। প্রাচীন লেখকদের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের লেখা পুঁথি সংগ্রহ করাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান কাজ। তাঁহার লাইব্রেরীতে প্লেটো, হোমার, সিসেরো, ভার্জিল প্রভৃতি মনীষীদের গ্রন্থ সংগৃহিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার লাইব্রেরীতে বসিয়া এই সকল প্রাচীন মনীষীদের সম্বন্ধে যাহা চিন্তা করিতেন তাহাই প্রত্যেকের নামে চিঠির মত করিয়া লিখিয়া রাখিতেন। প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি পেট্রার্কের গভীর অনুরাগ ক্রমে অপরের মনও স্পর্শ করিতে লাগিল এবং উহার চর্চ্চা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বহু উদ্যমশীল যুবক পেট্রার্কের শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বোক্কাশিয়ো। লোকের মনে

প্রাচীন সাহিত্য ও মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় হোমারের ইলিয়ড এবং ওডিসি সর্ব্ব-প্রথমে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছিল।

ইউরোপে নবজাগরণের যুগে সাহিত্যক্ষেত্রে পেট্রার্ক ও বোক্কাশিয়োর নাম যেমন প্রসিদ্ধ, রাজনীতিক্ষেত্রে তেমনি ম্যাকিয়াভিলির নাম সুবিদিত। কুটিল ও নীতিবর্জিত রাজনীতির প্রবর্ত্তক বলিয়া তিনি সর্ব্বজনবিদিত। ম্যাকিয়াভিলিকে আমাদের দেশের চাণক্যের সঙ্গে অনেক সময় তুলনা করা হয়। তাঁহার রচিত প্রিন্স বা 'রাজন্য' নামক গ্রন্থ পাঠে আমরা তাঁহার এই কুটিল রাজনীতির কথা জানিতে পারি।



র‍্যাফেলের অঙ্কিত ম্যাডোনা

সাহিত্য ও রাজনীতি ছাড়া চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য-শিল্পও নূতন রূপ গ্রহণ করিল। এই সকল শিল্পে যাঁহারা রূপান্তর ঘটাইয়াছিলেন

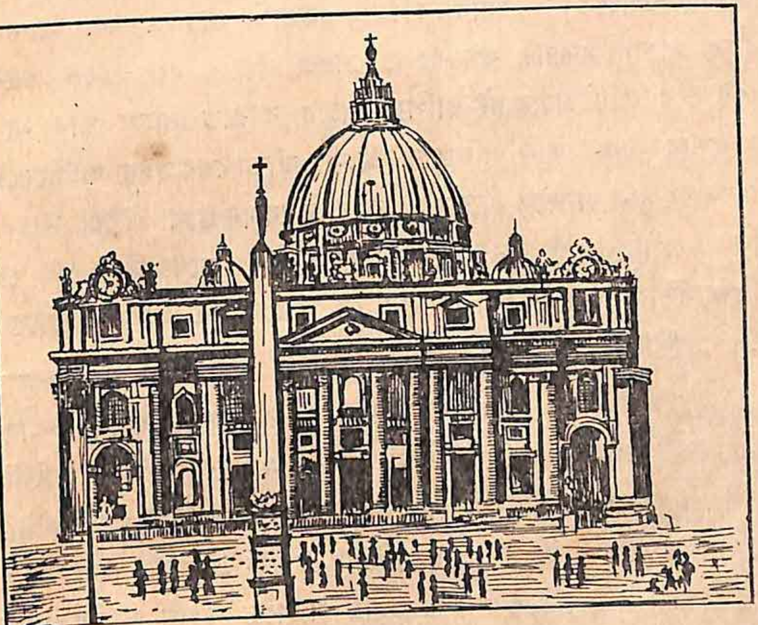
তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন র‍্যাফেল, মিকেল অ্যাঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। র‍্যাফেলের অঙ্কিত ম্যাডোনার (যিশু ও মাতা মেরী) ছবি জগদ্বিখ্যাত। মিকেল অ্যাঞ্জেলো ছিলেন চিত্রশিল্পী, ভাস্কর ও স্থপতি। ভাস্কর্য্যে তাঁহার দক্ষতা ছিল গ্রীক ভাস্করদেরই মত। তিনি পাথরের মূর্ত্তিতে সত্যিকার মানুষের ভাব ফুটাইয়া তুলিতেন। সেই জন্য তাঁহার নির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলি হইয়া উঠিত প্রাণবন্ত। লিওনার্দোও একাধারে ছিলেন চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক এবং যন্ত্র-নির্ম্মাতা বা ইঞ্জিনিয়ার। তোমরা জান যে রেলগাড়ীর ইঞ্জিন বাষ্পদ্বারা চালিত হয়। বাষ্পেরও যে শক্তি আছে এবং তাহাও যে কাজে লাগানো যায় তাহা লিওনার্দোই প্রথম আবিষ্কার করেন। আকাশে উড়িয়া বেড়ান যায় কিনা তাহা লইয়াও তিনি অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন।



দা ভিঞ্চির অঙ্কিত

এই সময় অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও গীর্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহাদের গঠনভঙ্গীর মধ্যেও নূতনত্ব ছিল। ইহাদের

মধ্যে মিলান নগরের ক্যাথেড্রালটি যেমনি বিরাট তেমনি সুন্দর। ইউরোপের মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা জমকাল গীর্জ্জা। ইহা আগাগোড়া মার্বেল পাথরের নির্ম্মিত। রোমের সেণ্ট পিটার গীর্জ্জাটি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।



সেণ্ট পিটার গীর্জ্জা

মধ্য যুগে ইউরোপীয় লোকেরা বিশ্বাস করিত যে সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে এবং সেই জন্যই দিন-রাত হয়। এই মতবাদ প্রথম প্রচার যিনি করেন তাঁহার নাম টলেমি। বাইবেলেও লেখা আছে পৃথিবী স্থিতিশীল। সুতরাং খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদের নিকট ইহাই ছিল শাস্ত্রবাক্য। কিন্তু নবজাগরণের ফলে জ্যোতির্বিদ্যায় ও গণিতশাস্ত্রে

দুইজন মহাপণ্ডিতের আবির্ভাব হইল। তাঁহারা নানা পরীক্ষা দ্বারা টলেমির মতবাদ যে ভুল তাহা প্রমাণ করিয়া দিলেন। প্রথম যিনি প্রমাণ করেন যে সূর্য্যই স্থিতিশীল এবং পৃথিবী তাহার নিজ অক্ষের উপর সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে তাহার নাম কপার্‌নিকাস। তিনি তাঁহার নূতন মতবাদ প্রমাণ করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিন্তু তাঁহার মতবাদ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, সেজন্য তাঁহার দণ্ড হইতে পারে এই ভয়ে তিনি তাঁহার বই ছাপিয়া প্রচার করিতে সাহস পান না। অবশেষে যখন তিনি বুঝিলেন তাঁহার জীবন শেষ হইয়া আসিতেছে তখন বইখানি ছাপিতে দিলেন। বইখানি যেদিন ছাপা ইইয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিল সেই দিনই তাঁহার মৃত্যু হইল। সুখের বিষয় এই যে তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে দেখিয়া গেলেন যে তাঁহার বই ছাপা হইয়াছে। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কপারনিকাসের পরে যে মনীষী তাঁহার সত্যানুসন্ধানের দ্বারা বিজ্ঞানজগতে বিপ্লব আনিয়াছিলেন তাঁহার নাম গ্যালিলিও। তিনি কপার্‌নিকাসের মতবাদকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম আকাশে গ্রহ উপগ্রহ দেখিবার উপযুক্ত 'টেলিস্কোপ' বা দূরবীণ যন্ত্র তৈরী করিয়াছিলেন এবং উহার সাহায্যে তিনি চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবীর মতই উচ্চ পাহাড় ও নিম্নভূমি বা গর্ত্ত আছে তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। বহু গ্রহ উপগ্রহও দূরবীণের ভিতর দিয়া তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল আবিষ্কার বাইবেলের বিরুদ্ধ বলিয়া ধর্ম্ম-আদালতে তাঁহার বিচার হয় এবং বিচারে তাঁহার ২২ দিনের জন্য কারাদণ্ড হয়। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হইয়াছিলেন। ৭৮ বৎসর বয়সে ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইটালীর চিত্রশিল্পের কথা বলিয়াছি। নবজাগরণের ফলে হল্যাণ্ডেও চিত্রশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ওলন্দাজ শিল্পীগণের তুলির স্পর্শে তাঁহাদের দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি অতিশয় চিত্তাকর্ষক ও মনোরম হইয়া ফুটিয়া উঠিত। ওলন্দাজ চিত্রশিল্পীদের মধ্যে র‍্যাম্‌ব্রাণ্ডের নাম অমর হইয়া আছে। তিনি রাজা, অপ্সরা বা দেব-দেবীর ছবি আঁকিতেন না। সাধারণ মানুষের ছবি আঁকিয়া তাহাদের মধ্যে বাস্তব জীবনের ভাব ফুটাইয়া তুলিতেন। মানুষের সুখ, দুঃখ, বেদনার প্রতিটি ভাব তাঁহার তুলিরস্পর্শে ফুটিয়া উঠিত। এমনকি হাসির পিছনে লুকান মনোভাব পর্য্যন্ত তাঁহার ছবিতে প্রকাশ পাইত।

ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের রাজত্বের শেষ দশ বৎসর ইংরাজি সাহিত্যের এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ। এই যুগে মহাকবি সেক্সপীয়ার নাট্য সাহিত্যে যে অমূল্য সম্পদ দান করেন তাহা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ২৭ বৎসর বয়সে তিনি নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন এবং মোট ৩৬ খানা নাটক লেখেন তাঁহার কয়েকখানি প্রসিদ্ধ নাটকের নাম হইল 'রোমিও জুলিয়েট', 'মার্চ্চেণ্ট অব ভিনিস', 'জুলিয়াস সিজার' এবং 'হ্যামলেট'। সেক্সপীয়ার তাঁহার



সেক্সপীয়ার

নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে শাশ্বত মানবচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেই জন্য তিনি কেবল ইংলণ্ডের কবি নহেন, তিনি বিশ্বের কবি।

এলিজাবেথের যুগে কাব্য ও নাট্য-সাহিত্যের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, গদ্য-সাহিত্যের সেরূপ উন্নতি না হইলেও এমন কয়েকজন চিন্তাশীল লেখকের আবির্ভাব হইয়াছিল যাঁহারা গদ্য-সাহিত্যকেও পুষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে স্যার ফ্রান্সিস বেকনএর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন গভীর চিন্তাশীল লেখক ছিলেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'এসেজ' বা প্রবন্ধাবলী একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ।

তোমরা এবারে বুঝিতে পারিলে যে ইউরোপের নবজাগরণ পুরাতন অন্ধ বিশ্বাসকে ভাঙ্গিয়া দিয়া সর্ব্ববিষয়ে নূতন ভাবধারা আনিয়া দিয়াছিল। ঠিক এই সময়ে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হইল এবং একসঙ্গে বহু বই ছাপা সম্ভব হইল। সুতরাং মুদ্রাযন্ত্র নবজাগরণের অগ্রগতি আরও সহজ করিয়া দিল। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের পূর্ব্বে সমস্ত গ্রন্থই হাতে লেখা হইত। একখানা গ্রন্থ লিখিতে অনেক সময় লাগিত। হাতে লেখা গ্রন্থকে পুঁথি বলা হয়। একখানি পুঁথি হইতে নকল করিয়া খুব অল্প কয়খানা বই প্রকাশ করা সম্ভব হইত। সেই নকল পুথির দামও অনেক বেশী হইত এবং খুব কম লোকেই তাহা পড়িতে পারিত। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ে অনেক বই প্রকাশ করা সম্ভব হইল। ছাপা বই নির্ভুল হইল এবং উহাদের দামও কম হইল। ফলে বহু লোক বই পড়িবার সুযোগ লাভ করিল।

ধর্ম্মসংস্কার

ইটালীতে নবজাগরণ জাগাইয়া তুলিয়াছিল মানুষের মনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের বাসনা এবং প্রাচীন গ্রীস ও রোমের

ঐহিক সভ্যতাকে ফিরাইয়া আনিবার প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু উত্তর ইউরোপে নবজাগরণ যে নূতন ভাবধারার সৃষ্টি করিল তাহা মানুষকে জিজ্ঞাসু করিয়া তুলিল। মানুষ প্রশ্ন না করিয়া, বিচার-বিশ্লেষণ না করিয়া কোন কিছুই আর বিশ্বাস করিতে পারিল না। পুরাতন রীতিগুলি মানিয়া লইতে তাহারা আপত্তি করিতে লাগিল। তাহাদের মন পুরাতন ধর্ম্মের সংস্কার সাধনে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। ইহারই ফলে খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিল এবং দুইটি দলের সৃষ্টি হইল। ইহাকেই ধর্ম্মসংস্কার বা 'রিফর্মেশন' বলা হয়।

কেন ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হইল সেই কথা এখন বলিতেছি। ইউরোপে তখন খৃষ্টধর্ম্মের যে রূপ ছিল তাহাকে বলা হইত রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম। প্রত্যেক রোমান ক্যাথলিক রোমের পোপকে প্রধান ধর্ম্মগুরু বলিয়া মানিত। প্রত্যেক দেশের ধর্ম্ম-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে পোপের ছিল পূর্ণ অধিকার। পোপ ধর্ম্মগুরু হইলেও এই সময় তিনি বিলাস ব্যসনে জীবন যাপন করিতেন। কেবল পোপ নয় সমগ্র ধর্ম্মযাজকেরাই ধর্ম্মকার্য্যে মন না দিয়া ভোগ-বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা অর্থলোভী ও দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন এবং তাঁহাদের জ্ঞানের অভাব ছিল। ধর্ম্মের নামে তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেন। লোকের অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ লইয়া তাঁহারা নিজেদের স্বার্থ সাধন করিতেন।

রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মমত অনুসারে পরলোকে তিনটি স্থান আছে। নরক, প্রেতলোক—যেখানে আত্মার পাপস্খলন করা হয়, এবং স্বর্গ। ক্যাথলিকেরা বিশ্বাস করিত আত্মীয়বন্ধুদের সৎকার্য্যের দ্বারা মৃতব্যক্তি শীঘ্র শীঘ্র পাপ মুক্ত হইতে পারে। সেই জন্য মধ্য যুগে বহু লোক মঠের

উদ্দেশ্যে প্রচুর দান করিত। মঠগুলি এইরূপ দানের ফলে বিত্তশালী হইয়া উঠিয়াছিল। প্রচুর ধন-দৌলতের অধিকারী হইয়া মঠের সন্ন্যাসীগণ ভোগবিলাসী হইয়া পড়িল। খৃষ্টানগণ আরও বিশ্বাস করিত যে পাপ-কার্য্য করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে পাপ স্বীকার করিলে এবং সৎকার্য্যের জন্য দান করিলেও পাপ মুক্ত হওয়া যায়। এই বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া অনেক পোপ অর্থ লইয়া পাপীদের পাপ হইতে মুক্তি দিতেন। এইরূপে পাপ হইতে মুক্তি দেওয়াকে 'ইণ্ডালজেন্স' বলা হইত।

বহু দিন হইতেই ইউরোপের নানা স্থানে চার্চ্চের অনাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছিল। যাঁহারা এই আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ইংলণ্ডের উইক্লিফ ও টমাস মোর, হল্যাণ্ডের ইরাসমাস্ এবং জার্ম্মানীর রুসলিনের নাম প্রসিদ্ধ। ইঁহারা কেহই বিপ্লবী ছিলেন না; কেবলমাত্র চার্চ্চের দোষগুলি দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। ক্যাথলিক ধর্ম্মে তাঁহাদের প্রগাঢ় আস্থা ছিল।

ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন সৃষ্টি হয় জার্ম্মানীতে। যিনি ক্যাথলিক ধর্ম্মকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করেন তাঁহার নাম মার্টিন লুথার। তিনি জ্ঞানে এবং ধর্ম্মপরায়ণতায় জার্ম্মানীতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমে ক্যাথলিক ধর্ম্ম ও পোপের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু তিনি একবার তীর্থ করিতে রোমে গমন করিয়া সেখানকার বিলাসিতা, লাম্পট্য এবং নানা অনাচার দেখিয়া মনে বড় আঘাত পান। রোম হইতে ফিরিয়া আসিবার কয়েক বৎসর পরে জার্ম্মানীতে উটেনবার্গ নগরে পোপের আদেশে রাস্তায় ইণ্ডালজেন্স বা পাপমুক্তি-পত্র খোলাখুলিভাবে বিক্রয় করিতে দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হন এবং ইহার প্রতিকারের কোন উপায় না দেখিয়া ইণ্ডালজেন্সের বিরুদ্ধে

পচানব্বই দফা আপত্তি লিখিয়া উটেনবার্গের গীর্জ্জার দরজায় আঁটিয়া দেন। তখন খবরের কাগজ ছিল না। কোন ঘোষণা জানাইতে হইলে ঘোষণাগুলি লিখিয়া গীর্জ্জার দরজায় টাঙ্গাইয়া রাখা হইত। লুথারের এই কার্য্যে ক্রুদ্ধ হইয়া পোপ তাঁহাকে সমাজ-



মার্টিন লুথার

চ্যুত করেন। লুথার পোপের আদেশ প্রকাশ্যভাবে পোড়াইয়া ফেলেন। ইহা হইতেই পোপের সহিত তাঁহার ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। তিনি বিদ্রোহী হইয়া উঠেন এবং ক্যাথলিক ধর্ম্ম অমান্য করিয়া নূতন এক ধর্ম্মমত প্রচার করেন। নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে

ভীত হইয়া ক্যাথলিকগণ এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় নূতন ধর্ম্মের কোন কোন মত প্রচার করা নিষিদ্ধ করিয়া ঘোষণা করা হয়। জার্ম্মানীর কয়েকজন নরপতি এবং কয়েকটি নগরের অধিবাসীগণ ইহার প্রতিবাদ করেন। এই জন্য লুথারের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে 'প্রোটেষ্ট্যান্ট' বা প্রতিবাদীদের ধর্ম্ম বলা হয়।

লুথারের নূতন ধর্ম্ম প্রচারের পর প্রায় একই সময়ে আরও দুইজন ধর্ম্মসংস্কারকের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের নাম জুইঙ্গ্লি ও ক্যালভিন। তাঁহারাও ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। কিন্তু সকল বিষয়ে লুথারের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহারাও নিজ নিজ মত প্রচার করেন। জুইঙ্গ্লি সুইজারল্যাণ্ডে এবং ক্যালভিন জেনেভাতে তাঁহাদের ধর্ম্মমত প্রচার করেন। জুইঙ্গ্লির ধর্ম্মমত ও ক্যালভিনের ধর্ম্মমতের মধ্যেও পার্থক্য ছিল। জুইঙ্গ্লি ও ক্যালভিন প্রত্যেকেই ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন। এইজন্য ইঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মমতকেও সাধারণভাবে প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্ম্ম বলা হয়।

ক্যালভিনের জন্ম হয় ফরাসী দেশে। তিনি প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্ম্মের সমর্থক ছিলেন বলিয়া সেখানে তাঁহাকে নানাভাবে নির্য্যাতন করা হয়। অবশেষে তিনি পালাইয়া জেনেভাতে আসেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত জেনেভাতেই বাস করেন। তাঁহার প্রভাবে জেনেভার ক্ষুদ্র রাজ্যটি একটি ধর্ম্মরাজ্যে পরিণত হয়।

ইংলণ্ডেও এই ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া লাগে। অষ্টম হেনরীর সময় ইংলণ্ডে ধর্ম্মসংস্কার আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডের ধর্ম্মসংস্কার জাতীয় আন্দোলনের ফলে হয় নাই—হইয়াছিল

রাজনৈতিক কারণে। হেনরী পোপকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজেকে সর্ব্ব-প্রধান বলিয়া যখন ঘোষণা করিলেন তখন হইতেই ইংলণ্ড রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তাহার পর হেনরী আরও একটি কাজ করিলেন। তিনি ইংলণ্ডের সন্ন্যাসীদের মঠগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া উহাদের বিপুল সম্পত্তি অধিকার করিয়া লইলেন।

ইহার পর এলিজাবেথ ইংলণ্ডের জন্য এক পৃথক ধর্ম্ম-ব্যবস্থা স্থির করিয়া দেন। ইহার ফলে ইংলণ্ড রোমান ক্যাথলিক বা প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মমতের কোনটাই পুরাপুরি গ্রহণ করিল না। উভয় ধর্ম্মেরই কিছু কিছু লইয়া নূতন অ্যাঙ্গলিকান চার্চ্চ বা ইংলণ্ডের ধর্ম্মমত গঠিত হইল।

লুথারের ধর্ম্মসংস্কারের পূর্ব্বে মধ্যযুগে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের লোক রোমান ক্যাথলিক ছিল। গ্রীস প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলের কয়েকটি দেশ ছাড়া ইউরোপের অধিকাংশ দেশে খৃষ্টধর্ম্মের তখন অন্য কোন সম্প্রদায় ছিল না। সেই জন্য ইউরোপে একটা ঐক্যের ভাব ছিল। যাহার ফলে তখন ইউরোপের অন্য নাম ছিল খৃষ্টের রাজ্য বা 'ক্রাইসেনডম।' লুথারের ধর্ম্ম-সংস্কারের ফলে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাতে ইউরোপের একতা নষ্ট হইয়া যায়, এবং সর্ব্বত্র প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে সংগ্রাম চলিতে থাকে। এই সকল যুদ্ধকে ধর্ম্মযুদ্ধ বলা হয়। প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া এইরূপ ধর্ম্মযুদ্ধ চলিয়াছিল। জার্ম্মানীতে ধর্ম্মের নামে ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যে-যুদ্ধ হয় তাহাই ইউরোপের শেষ ও সর্ব্ববৃহৎ ধর্ম্মযুদ্ধ। ইহাকে ত্রিংশবৎসরের যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধে এত বেশী লোকক্ষয় হয় এবং জার্ম্মানীর

এত বেশী ক্ষতি হয় যে ইহার পর আর কোন ধর্ম্মযুদ্ধ হয় নাই। লোকে ক্রমে ধর্ম্ম বিষয়ে সহনশীল হইয়া উঠে।

এই সময়ে ভারতে ও চীনেও বহু ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল; কিন্তু এই দুই দেশে ধর্ম্মের নামে এমন ভীষণ যুদ্ধ কখনও হয় নাই। এই দুইটি দেশ ইউরোপ অপেক্ষা ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক বেশী সহনশীল ছিল।

অনুশীলনী

১। রেনোসাঁ বা নবজাগরণ কাহাকে বলে?

২। নবজাগরণের ফলে ইউরোপে কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল?

৩। নবজাগরণের সূচনা কোথায় এবং কেন হয়?

৪। পেট্রার্ক, বোক্কাশিয়ো, র‍্যাফেল, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মিকেল অ্যাঞ্জেলো, কপার্নিকাস ও গ্যালিলিও সম্বন্ধে কি জান?

৫। ইউরোপে রিফর্মেশন বা ধর্ম্মসংস্কার করিয়াছিল কে? তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নাম কি?

৬। ক্যালভিন ও জুইঙ্গ্লির বিষয় কি জান?

৭। ইউরোপে মধ্যযুগে কোন ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল? প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের ফল কি হইয়াছিল?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভৌগোলিক আবিষ্কার ও ইউরোপীয় সভ্যতা

ইউরোপ নবজাগরণের এবং ধর্ম্মসংস্কারের যুগে জ্ঞান, বিজ্ঞান, চারুশিল্প ও সাহিত্যে কত উন্নতি করিয়াছিল তাহা পূর্ব্ব অধ্যায় পাঠে তোমরা জানিতে পারিয়াছ। ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং ইউরোপের বিস্তার সাধন এই যুগের আর একটি প্রধান কীর্ত্তি। মধ্যযুগে পৃথিবী সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান ছিল খুব সঙ্কীর্ণ। নবজাগরণের যুগে ভৌগোলিক জ্ঞান এমন ভাবে প্রসার লাভ করিল যে ইউরোপীয়দের নিকট পৃথিবীর সদর দরজাটা খুলিয়া গেল। তাহারা দুর্জ্জয় সাহস ও আত্মবিশ্বাস লইয়া অজানা মহাসাগরে নৌকা ভাসাইয়া সুদূর দেশের সন্ধানে ছুটিল। এই দুঃসাহসিক অভিযানে তাহাদের প্রাণে প্রেরণা জাগাইয়াছিল বাণিজ্যলিপ্সা ও খৃষ্টের ধর্ম্মপ্রচারের আগ্রহ। ইহা ছাড়া পৃথিবী যে গোলাকার তাহাও এই সময় স্থিরীকৃত হইয়াছিল। সমুদ্রে চলাচলের উপযোগী কম্পাস নির্ম্মিত হইয়াছিল। নানাদেশের তালিকা ও মানচিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। দিঙ্মণ্ডল হইতে ধ্রুবতারার উচ্চতা পরিমাপ করিবার যন্ত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এইগুলি না থাকিলে হয়ত মহাসাগর অতিক্রম করিবার সাহস তাহাদের মনে স্থান পাইত না।

ব্যবসা-বাণিজ্য

প্রাচীন কাল হইতেই চীন, ভারত ও পারস্যের বিলাস-সামগ্রীগুলির ইউরোপে যথেষ্ট সমাদর ছিল। কিন্তু ঐ দেশগুলি সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণা ছিল না। ঐগুলি ছিল তাহাদের নিকট স্বপ্নপুরী। মধ্যযুগে মার্কো পোলো নামে একজন ইউরোপীয় পর্য্যটক চীন, জাপান, ব্রহ্ম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশগুলি ভ্রমণ করিয়া একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। যাঁহারা পরবর্ত্তীকালে সুদূর দেশগুলি আবিষ্কার করিয়া ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন তাঁহারা ঐ গ্রন্থখানি অতি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন।

মধ্য যুগে প্রাচ্য দেশগুলির সহিত ইউরোপের ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল ভূমধ্যসাগর। আরব সওদাগরেরা পূর্ব্ব এশিয়া হইতে এলাচ, দারুচিনি প্রভৃতি সুগন্ধি মসলা, মণি-মাণিক্য, ঔষধ, কাঁচ, চীনামাটির বাসন, রেশম, সাটিন, কম্বল, চিত্রিত পর্দ্দার কাপড়, ধাতু-নির্ম্মিত জিনিস, স্থল ও জলপথে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বতীরে লইয়া আসিত। সেখান হইতে ইটালীর ভিনিস, জেনোয়া ও পিসার বণিকেরা ঐ সকল দ্রব্য লইয়া ইউরোপের বাজারে বিক্রয় করিত। ঐ সকল দ্রব্যের বিনিময়ে আরব সওদাগরেরা ইউরোপের মোটা পশমী কাপড়, পারা, তামা, প্রবাল প্রভৃতি জিনিস ক্রয় করিত। কিন্তু ঐ সকল জিনিসের মূল্য ছিল কম। সুতরাং উহাদ্বারা আরব সওদাগরদের প্রাপ্য মূল্য শোধ হইত না। অবশিষ্ট মূল্যের জন্য ইউরোপীয় বণিকগণকে অনেক স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দিতে হইত। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল ছিল আরবদের ব্যবসার ঘাঁটি। সেখান হইতে মাল ক্রয় করিয়া তাহারা ভারত সাগর ও লোহিত সাগরের পথে ভূমধ্যসাগরে আসিত।

অটোম্যান তুর্কীগণ পূর্ব্ব ইউরোপ অধিকার করিয়া লইবার পর প্রাচ্যদেশের সহিত ইউরোপের বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। প্রাচ্যের বিলাস-সামগ্রীর সরবরাহ ইউরোপে কমিয়া যায়। এই জন্য মহাসাগরের মধ্য দিয়া সুগন্ধি মসলার দেশে যাইবার পথ আবিষ্কার করিবার আগ্রহ ইউরোপীয়দের মনে জাগিয়া ওঠে। ইহারই ফলে দেশ আবিষ্কারের অভিযান আরম্ভ হয়। এই কাজে প্রথম অগ্রসর হইয়াছিলেন ইটালীর অভিজ্ঞ নাবিকগণ। কিন্তু ইটালীর ভিনিস প্রভৃতি পুরাতন নগরগুলির নিকট হইতে তাঁহারা কোন উৎসাহ লাভ করেন নাই। ইউরোপের পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্ত্তী নূতন রাষ্ট্রগুলিই এই সামুদ্রিক অভিযানে প্রথম উদ্যোগী হয় এবং লাভবান হয়। ইহারই ফলে এই সময়ে আটলান্টিকের তীরবর্ত্তী স্থানগুলি ইউরোপের বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হয়।

বহির্জগতে ইউরোপের সম্প্রসারণে পর্ত্তুগালই সর্ব্বপ্রথমে অগ্রসর হয়। ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের এই ক্ষুদ্র দেশটি আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত বলিয়া ইহার অধিবাসীদিগকে সাগর অভিযানে সাহসী করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা বহুদিন হইতেই আটলান্টিক মহাসাগর দিয়া দক্ষিণ দিকে আফ্রিকার পশ্চিম তীরে অভিযান চালাইতেছিল এবং ঐ রূপে অগ্রসর হইয়া তাহারা ভারত এবং চীনে যাইয়া পৌঁছাইবার স্বপ্নজাল বুনিতেছিল।

ভৌগোলিক আবিষ্কার

এই স্বপ্ন কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে অগ্রসর হন পর্ত্তুগালের রাজ পরিবারের একজন রাজকুমার। তাঁহার

নাম হেনরী। ইতিহাসে তিনি নাবিক হেনরী নামে পরিচিত। তিনি কিন্তু নাবিক ছিলেন না। নূতন ভৌগোলিক জ্ঞানের সাহায্যে কি করিয়া নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়া সেখানে খৃষ্টের ধর্ম্ম প্রচার করা যায় এবং পর্ত্তুগালের সাম্রাজ্যবিস্তার ও অর্থলাভ সম্ভব হয় সে বিষয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করিতেন। নাবিকদের শিক্ষার জন্য তিনি পর্ত্তুগালে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে ইটালীর নাবিকগণ শিক্ষালাভের জন্য আসিত। প্রত্যেকেই তাঁহার নিকট হইতে দুঃসাহসিক সমুদ্র-যাত্রার প্রেরণা লাভ করিত। ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর ২৮ বৎসর পরে তাঁহার স্বপ্ন সফল করেন একজন পর্ত্তুগীজ নাবিক—বার্থোলোমিউ ডিয়াস।

১৪৮৮খৃষ্টাব্দে ডিয়াস আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তসীমায় পৌঁছাইতে সক্ষম হন। তিনি ঐ স্থানের নাম দিলেন 'ঝটিকা অন্তরীপ'। কিন্তু পর্ত্তুগালের তখনকার রাজা এই আবিষ্কারে উৎফুল্ল হইয়া ঐ নাম বদলাইয়া উহার নাম দিলেন 'উত্তমাশা অন্তরীপ'।



ভাস্কো ডি গামা

ইহার পর ভাস্কো ডি গামা উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া আফ্রিকার পূর্ব্ব তীর ধরিয়া উত্তর দিকে জাঞ্জিবার

পর্য্যন্ত অগ্রসর হন এবং একজন আরব পথপ্রদর্শকের সাহায্যে ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন (১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে) এবং কালিকট নগরে অবতরণ করেন। এইরূপে ভাস্কো ডি গামা সর্ব্বপ্রথমে মহাসাগরের মধ্য দিয়া ইউরোপ হইতে সুদূর প্রাচ্যে যাইবার পথ আবিষ্কার করেন। এই সময় হইতে পূর্ব্ব দেশগুলির সহিত পর্ত্তুগালের রীতিমত বাণিজ্য আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষে তাহারা স্থানে স্থানে ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন করে। ইহাদের মধ্যে গোয়া নগরী ছিল প্রধান। অনেক ধর্ম্ম-প্রচারক এই স্থানে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিল।

পর্ত্তুগীজদের ন্যায় স্পেনও নূতন দেশের সন্ধানে মহাসাগরের পথে বাহির হইয়াছিল। স্পেনের রাণী ইসাবেলার সাহায্যে জেনোয়ার একজন নাবিক আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম কলোম্বাস। কিন্তু মার্কো-পোলোর বই পড়িয়া তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে আটলাণ্টিক পার হইতে পারিলেই জাপান দেশটির সন্ধান পাওয়া যাইবে। বহু চেষ্টার পর রাণী ইসাবেলা তাঁহাকে তিনখানি ছোট জাহাজ দিয়া সাহায্য করেন। তিনি স্পেন হইতে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে



কলোম্বাস

নাম হেনরী। ইতিহাসে তিনি নাবিক হেনরী নামে পরিচিত। তিনি কিন্তু নাবিক ছিলেন না। নূতন ভৌগোলিক জ্ঞানের সাহায্যে কি করিয়া নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়া সেখানে খৃষ্টের ধর্ম্ম প্রচার করা যায় এবং পর্ত্তুগালের সাম্রাজ্যবিস্তার ও অর্থলাভ সম্ভব হয় সে বিষয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করিতেন। নাবিকদের শিক্ষার জন্য তিনি পর্ত্তু-গালে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে ইটালীর নাবিকগণ শিক্ষালাভের জন্য আসিত। প্রত্যেকেই তাঁহার নিকট হইতে দুঃসাহসিক সমুদ্র-যাত্রার প্রেরণা লাভ করিত। ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর ২৮ বৎসর পরে তাঁহার স্বপ্ন সফল করেন একজন পর্ত্তুগীজ নাবিক—বার্থোলোমিউ ডিয়াস।



ভাস্কো ডি গামা

১৪৮৮খৃষ্টাব্দে ডিয়াস আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তসীমায় পৌঁছাইতে সক্ষম হন। তিনি ঐ স্থানের নাম দিলেন 'ঝটিকা অন্তরীপ'। কিন্তু পর্ত্তুগালের তখনকার রাজা এই আবিষ্কারে উৎফুল্ল হইয়া ঐ নাম বদলাইয়া উহার নাম দিলেন 'উত্তমাশা অন্তরীপ'।

ইহার পর ভাস্কো ডি গামা উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া আফ্রিকার পূর্ব্ব তীর ধরিয়া উত্তর দিকে জাঞ্জিবার

পর্য্যন্ত অগ্রসর হন এবং একজন আরব পথপ্রদর্শকের সাহায্যে ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন (১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে) এবং কালিকট নগরে অবতরণ করেন। এইরূপে ভাস্কো ডি গামা সর্ব্বপ্রথমে মহাসাগরের মধ্য দিয়া ইউরোপ হইতে সুদূর প্রাচ্যে যাইবার পথ আবিষ্কার করেন। এই সময় হইতে পূর্ব্ব দেশগুলির সহিত পর্ত্তুগালের রীতিমত বাণিজ্য আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষে তাহারা স্থানে স্থানে ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন করে। ইহাদের মধ্যে গোয়া নগরী ছিল প্রধান। অনেক ধর্ম্ম-প্রচারক এই স্থানে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিল।

পর্ত্তুগীজদের ন্যায় স্পেনও নূতন দেশের সন্ধানে মহাসাগরের পথে বাহির হইয়াছিল। স্পেনের রাণী ইসাবেলার সাহায্যে জেনোয়ার একজন নাবিক আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম কলোম্বাস। কিন্তু মার্কো-পোলোর বই পড়িয়া তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে আটলান্টিক পার হইতে পারিলেই জাপান দেশটির সন্ধান পাওয়া যাইবে। বহু চেষ্টার পর রাণী ইসাবেলা তাঁহাকে তিনখানি ছোট জাহাজ দিয়া সাহায্য করেন। তিনি স্পেন হইতে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে



কলোম্বাস

আগষ্ট মাসে অজানার সন্ধানে যাত্রা করেন। দুই মাস ধরিয়া জাহাজে পাল তুলিয়া সীমাহীন মহাসাগরের মধ্য দিয়া তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার লোকজনেরা ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিল এবং তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিল ; কিন্তু তিনি তাঁহার বিশ্বাসে অটল রহিলেন। অবশেষে তাঁহারা একদিন কতকগুলি পাখী উড়িতে এবং একটি গাছের ডাল ভাসিয়া যাইতে দেখিলেন। ইহাতে সকলের মনে আশার সঞ্চার হইল, কারণ তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন নিকটেই জমি আছে। অক্টোবর মাসে একদিন সত্য সত্যই তাঁহারা তীরভূমি দেখিতে পাইলেন। কলোম্বাস স্পেনের পতাকা হস্তে তীরে অবতরণ করিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন। ঐ স্থানটি ছিল একটি দ্বীপ। ওখানকার অধিবাসীদের গায়ের রং ছিল তামাটে। উহাদের গায়ের রং দেখিয়া কলোম্বাস মনে করিলেন যে ঐ স্থানটি ভারতের একটা অংশ, জাপান নয়। ঐ দ্বীপের নিকটে আরও দ্বীপ ছিল। কলোম্বাস উহাদের নাম দিলেন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং তামাটে রংএর লোকদের নাম দিলেন লাল রংএর ভারতবাসী বা রেড ইণ্ডিয়ান্‌স্। তিনি কতকগুলি বিচিত্র পশু-পক্ষী এবং লাল মানুষ লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার এই বিরাট সাফল্যে দেশের লোক উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি মোট তিনবার তাঁহার আবিষ্কৃত দেশে গিয়াছিলেন। উহা যে একটি নূতন মহাদেশ তাহা তিনি মোটেই বুঝিতে পারেন নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার খ্যাতি ও সম্মান অনেকের মনে ঈর্ষার সৃষ্টি করিল। তৃতীয় অভিযান হইতে তাঁহাকে বন্দী করিয়া স্পেনে আনা হইল। বড়ই দুঃখের বিষয় যে স্পেনের অধিবাসীরা শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি

সুবিচার করে নাই। তাঁহার প্রতি এমন অবিচার করা হইল যে নূতন দেশটির নাম পর্যন্ত তাঁহার নামে করা হইল না। ফ্লোরেন্স নগরের একজন নাবিকের নাম ছিল অ্যামেরিগো, তাঁহার নাম অনুসারে ঐ মহাদেশের নাম হইয়াছে আমেরিকা।

কলোম্বাসের অসামান্য সাফল্য পশ্চিম ইউরোপের অনেককে নূতন দেশ আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এই সকল দুঃসাহসিক নাবিকদের মধ্যে ম্যাগেলানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ম্যাগেলান ছিলেন পর্তুগীজ। তিনি স্পেনের রাজার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র পাঁচখানি জাহাজ লইয়া স্পেন হইতে অজানা সাগরপথের অনুসন্ধানে যাত্রা করেন। তিনি আটলান্টিক অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ তীর ধরিয়া অগ্রসর হন এবং বিপদসঙ্কুল একটি প্রণালীর মধ্য দিয়া প্রশান্ত সাগরে প্রবেশ করেন। ঐ প্রণালীটি আজও তাঁহারই নাম ধারণ করিয়া অসাধারণ কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। তাহার পর ৯৮ দিন কূল-কিনারাহীন বিশাল প্রশান্ত সাগরের মধ্য দিয়া তাঁহার জাহাজগুলি চলিতে থাকে। অবশেষে ১৫২১ খৃষ্টাব্দে তিনি ফিলিপ্পিন দ্বীপপুঞ্জে আসিয়া পৌছান। কিন্তু


ম্যাগেলান

দুর্ভাগ্যবশতঃ ম্যাগেলান তথাকার অধিবাসীদের হস্তে নিহত হন। তাহার পর তাঁহার নাবিকগণ ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়া আফ্রিকা ঘুরিয়া দেশে ফিরিবার জন্য যাত্রা করেন। শেষ পর্য্যন্ত পাঁচখানির মধ্যে মাত্র একখানি জাহাজ স্পেনে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছিল, বাকী-গুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কলোম্বাস সর্ব্বপ্রথম আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আর ম্যাগেলান সর্ব্বপ্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন।

ইহার পর হইতে স্পেন ও পর্ত্তুগাল সারা পৃথিবীতে ইউরোপীয় প্রাধান্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্য্যন্ত উহারাই সমুদ্র অতিক্রমে ও উপনিবেশ স্থাপনে একাধিপত্য বজায় রাখিয়াছিল। রোমের পোপ আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত জাঞ্জিবার দ্বীপপুঞ্জ হইতে ৩০০ মাইল দূরে উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত একটি সরল রেখা টানিয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে উহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। ইহাকে বলা হয় পোপের সীমারেখা। ঐ রেখার পশ্চিম দিকে অবস্থিত সমগ্র দেশগুলি স্পেনের এবং পূর্ব্বদিকস্থ দেশগুলি পর্ত্তুগালের এলাকাভুক্ত বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করেন। ইহা দ্বারা উভয় রাজ্য উভয়ের এলাকাভুক্ত দেশ-গুলিতে নিজেদের আধিপত্য বা উপনিবেশ স্থাপনের এবং উহাদের সহিত বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়াছিল।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে পর্ত্তুগালের এলাকা এশিয়া ও আফ্রিকার নানাস্থানে পর্ত্তুগীজেরা বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করিল। বাণিজ্য করিয়া পর্ত্তগাল বহু লাভবান হইতে লাগিল, কিন্তু দেশ জয় করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিল না। পর্ত্তুগাল রাজ্যটি ত ছোট। ভারতবর্ষ বা চীনের মত বৃহৎ দেশ জয় করিবার শক্তি তাহার ছিল না। তাহা

হইলেও ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দিকে মাত্র গোয়াতে এবং মালাবার উপকূলে তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং ঐ উপনিবেশগুলিতে পর্ত্তুগীজ ভাষার প্রচলন করিয়াছিল।

স্পেন কিন্তু তাহার এলাকায় পর্ত্তুগালের মত বাণিজ্য বিস্তার করিতে পারে নাই। তাহার এলাকার মধ্যে ছিল নব আবিষ্কৃত আমেরিকার দুইটি মহাদেশ। সেখানে তাহারা স্থাপন করিল উপনিবেশ। আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করা সহজ ছিল। সেখানে এশিয়ার মত ঘন বসতি ছিল না। সেখানকার অধিবাসীদের বলা হইত রেড ইণ্ডিয়ান্স্। তাহারা সভ্য ছিল না। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে হার্ণাণ্ডো কর্টেজ নামে একজন স্পেনের যুবক ১০টি জাহাজ, ৭ শত সৈন্য, ১৮টি ঘোড়া এবং কয়েকটি কামান লইয়া গিয়া সহজেই মেক্সিকো অধিকার করেন। তথাকার অধিবাসীরা কামানের গর্জ্জন শুনিয়া কর্টেজকে স্বয়ং ভগবান মনে করিয়া তাঁহাকে কোন বাধাই দিল না। মেক্সিকো স্পেনের অধিকারে আসিল।

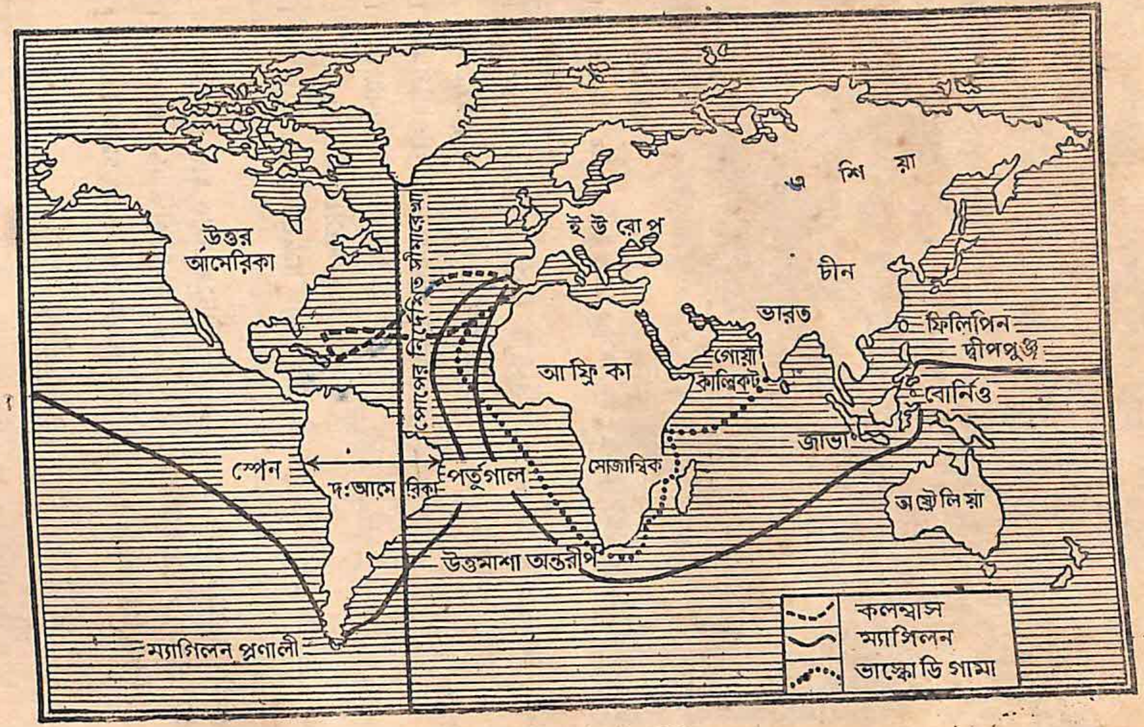
ফ্রান্সিসকো পিজারো নামে আর একজন ভাগ্যান্বেষী স্পেনীয় সৈন্য ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে ৩ খানি জাহাজ, ১৮০ জন সৈন্য এবং ২৭টি ঘোড়া লইয়া পেরু আক্রমণ করেন এবং তিনিও সহজেই ঐ দেশটি অধিকার করিয়া লন। মেক্সিকো ও পেরু জয় করিয়া কর্টেজ ও পিজারো আগণিত সোনা, রূপা ও মণিমাণিক্য লাভ করেন। মেক্সিকো ও পেরুতে বহু মূল্যবান খনি ছিল। সেগুলিও তাঁহাদের অধিকারে আসিল। এইরূপে আমেরিকায় স্পেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল। যেখানেই স্পেনীয়গণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল সেখানেই তাহারা তাহাদের ভাষা ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

পর্ত্তুগীজদের সৌভাগ্য দেখিয়া ইউরোপের অন্যান্য জাতিগুলি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিল এবং তাহাদের মনেও পর্ত্তুগীজদের ন্যায় ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। তাহারা পোপের সীমারেখা অমান্য করিতে দ্বিধা বোধ করিল না। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে পর্ত্তুগীজদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অগ্রসর হইল ওলন্দাজেরা। ক্রমে ফরাসী ও ইংরাজগণ এশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকায় স্পেনের ও পর্ত্তুগালের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্য সমুদ্রপথে ঐ সকল স্থানে যাইতে লাগিল।

বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনের জন্য এইরূপে ইউরোপীয়গণের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। ইহাদের মধ্যে আটলান্টিক তীরবর্ত্তী পর্ত্তুগাল, স্পেন, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড এই পাঁচটি রাজ্য সমগ্র পৃথিবীতে তাহাদের উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল।

ইহার ফলে ভূমধ্যসাগরের প্রাচীন বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির আর গুরুত্ব থাকিল না। ক্রমে সেগুলি নষ্ট হইয়া গেল। পূর্ব্বে এশিয়ার সহিত বাণিজ্য করিতে ইউরোপীয়দের নির্ভর করিতে হইত আরব বণিকদের উপর। এখন মহাসাগরের পথ খুলিয়া যাওয়ায় তাহারা নিজেরাই সুদূর দেশে যাইয়া বাণিজ্য করিতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের লাভও প্রচুর হইতে লাগিল।

কেবল বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য স্থাপনই তাহারা করিল না, সমগ্র পৃথিবীতে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রসার সাধনেও তৎপর হইয়া উঠিল। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া পূরাপূরি ইউরোপীয় হইয়া গেল। অন্যান্য দেশও ঐ সভ্যতা ধীরে ধীরে গ্রহণ করিতে লাগিল।


উত্তর আমেরিকা
পোপের নির্দেশিত সীমারেখা
ইউরোপ
এশিয়া
চীন
ভারত
ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ
গোয়া
কালিকট
আফ্রিকা
বোর্নিও
জাভা
মোজাম্বিক
অস্ট্রেলিয়া
স্পেন
দঃ আমেরিকা
পর্তুগাল
উত্তমাশা অন্তরীপ
ম্যাগিলন প্রণালী
কলম্বাস
ম্যাগিলন
ভাস্কো ডি গামা

অনুশীলনী

১। নবজাগরণের ফলে কেমন করিয়া সমুদ্র অভিযান সম্ভব হইয়াছিল ?

২। কে সর্ব্ব প্রথম আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়াছিলেন ? তিনি কোন দেশ আবিষ্কার করিয়াছিলেন ? তাঁহার প্রথম নৌঅভিযানের কাহিনীটি বর্ণনা কর।

৩। যিনি সর্বপ্রথম সমুদ্রপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম কি ? তাঁহার নৌঅভিযানের বিষয় কি জান ?

৪। ভাস্কো-ডি-গামার সম্বন্ধে কি জান ?

৫। পোপের সীমারেখা কাহাকে বলে ? সারা পৃথিবীতে ইউরোপীয় প্রাধান্য বিস্তারে ইউরোপের কোন্ কোন্ জাতি অগ্রণী হইয়াছিল ?

৬। ইউরোপের কোন্ কোন্ দেশ পৃথিবীতে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল ?

৭। সমুদ্রপথ আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল ?

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতে মোগল অধিকার

ইউরোপে যখন নবজাগরণ ও ধর্ম্মসংস্কারের যুগ চলিতেছিল ভারতে তখন মোগল সম্রাটগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। মোগল সাম্রাজ্য যিনি স্থাপন করেন তাঁহার নাম বাবর।

বাবর

তৈমুর লঙ্গের আক্রমণে দিল্লীর পাঠান সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু লোদী বংশের সুলতানরা আবার দিল্লীর সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। লোদী বংশের কথা তোমরা আগেই পড়িয়াছ। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে লোদী বংশীয় সুলতান ইব্রাহিমকে পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন এবং ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। বাবর ছিলেন তৈমুর ও চেঙ্গিজ খানের বংশধর। তাঁহার স্থাপিত সাম্রাজ্য আয়তনে ছোট ছিল। দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর বাবর রাজপুত-বীর মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহকে খানুয়ার যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং বাংলা ও বিহার জয় করিয়া



বাবর

প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁহার আধিপত্য স্থাপন করেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হয়।

হুমায়ুন ও শের শাহ

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর অধীশ্বর হইলেন। বাবর পাঠানদিগকে জয় করিয়াছিলেন কিন্তু বশীভূত করিতে পারেন নাই। সেই জন্য হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর দুইজন পাঠান সর্দ্দার বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের একজন হইলেন গুজরাটের বাহাদুর শাহ এবং আর একজন হইলেন বাংলার শের খাঁ। হুমায়ুন বাহাদুর শাহকে পরাজিত করিয়াছিলেন কিন্তু শের খাঁকে কিছুতেই পরাজিত করিতে পারিলেন না। অবশেষে দিল্লী ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। শের খাঁ শের শাহ নাম ধারণ করিয়া নিজেকে দিল্লীর সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পর বৎসর হুমায়ুন হৃতরাজ্য উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু এবারেও শের শাহের নিকট কাণোজের যুদ্ধে পরাভূত হইলেন।



হুমায়ুন

সম্রাট হইয়া শের শাহ রাজ্য-বিস্তার ও রাজ্য সুশাসনের দিকে মন দিলেন। সুশাসনের জন্য শের শাহের রাজত্ব প্রসিদ্ধ। হুমায়ুনের

সহিত শেষ যুদ্ধের পর তিনি মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার অধিকাংশ সময়ই তাঁহার যুদ্ধ-বিগ্রহে কাটিয়াছিল। কিন্তু এমনি তাঁহার ক্ষমতা ছিল যে এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি শাসনপদ্ধতির ব্যাপক সংস্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যকে কতকগুলি 'সরকারে' বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সরকারে সুবিচার, শান্তি রক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শের শাহ সাম্রাজ্যের জমি জরিপ করিয়া ভূমিরাজস্বের হার নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। কৃষকদিগকে উৎপন্ন ফসলের একচতুর্থাংশ রাজস্ব দিতে হইত। প্রজাদের অধিকার সুনির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য শের শাহ কবুলিয়ত ও পাট্টাপ্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি স্থানীয় কর্ম্মচারীদের কোন প্রকার অত্যাচার করিতে দিতেন না। বিচারকার্য্য নিরপেক্ষভাবে সুসম্পন্ন হইত। তিনি প্রচলিত মুদ্রার সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন। তিনি অনেক বড় বড় রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়া বণিকদের সুবিধার জন্য তাহার দুই পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ, কূপ খনন এবং বহু সরাইখানা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে তাহা তিনিই নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি ডাক



শের শাহ

বিভাগের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এবং ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করিয়াছিলেন। পুলিশ বিভাগেরও তিনি সংস্কার করিয়াছিলেন। সামান্য পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি কি করিয়া এতগুলি কাজ করিয়াছিলেন তাহা বিস্ময়ের বিষয়। রাজস্ব আদায় প্রভৃতি অনেক বিষয়ে আকবর শের শাহের নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন।

১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে শের শাহ কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করেন। এই সময় বারুদের আগুনে পুড়িয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। সাসারামে তাঁহার সমাধি-সৌধ আজিও সেকালের স্থাপত্য-শিল্পের পরিচয় দিতেছে।

হুমায়ুন শের শাহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান। পারস্যে যাইবার পথে অমরকোটে তাঁহার বিখ্যাত পুত্র আকবরের জন্ম হয় (১৫৪২)।

হুমায়ুন শিশুপুত্র আকবরকে তাঁহার এক ভ্রাতার নিকট রাখিয়া পারস্যের রাজার আশ্রয় লন। সেখানে যাইয়া তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। কিছুদিন পরেই কাবুল জয় করেন। শের শাহের মৃত্যুর পর তিনি দিল্লীর সিংহাসন পুনরায় অধিকার করিয়া লন। কিন্তু সিংহাসন লাভের কয়েক মাস পরেই গ্রন্থশালার সিঁড়ি হইতে পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু হয় (১৫৫৬)।

আকবর

আকবর যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তিনি মাত্র ১৫ বৎসরের বালক। কিন্তু তাঁহার শত্রুর অভাব ছিল না। অল্প বয়স্ক ও অনভিজ্ঞ হইলেও নিজের শক্তি ও বুদ্ধিবলে তিনি শত্রুদের দমন

করিতে ও সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হুমায়ুন দিল্লী ও আগ্রা ছাড়া বাবরের সাম্রাজ্যের কোন অংশই উদ্ধার করিতে পারেন নাই। উত্তর ভারতে তখন অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঐ সকল রাজ্যের রাজারা আকবরের আধিপত্য স্বীকার করিলেন না। শের শাহের বংশধর আদীল শাহ আকবরকে তাড়াইয়া দিবার জন্য তাঁহার হিন্দু সেনাপতি হিমুকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সহিত আকবরের বন্ধু ও সেনাপতি বৈরাম খাঁর পানিপথ-ক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়। হিমু পরাজিত ও নিহত হন। ইহাই পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পর ভারতে পাঠান আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল। এইরূপে আকবরকে নূতন করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে হইয়াছিল। এই কারণে তাঁহাকেই মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে।



আকবর

পানিপথের যুদ্ধের পর আকবর, যে সকল রাজা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন নাই ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সকলের রাজ্যই জয় করিয়া ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন। যাঁহারা অতুল বীরত্ব ও সাহসের সহিত আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের

বিভাগের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এবং ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করিয়াছিলেন। পুলিশ বিভাগেরও তিনি সংস্কার করিয়াছিলেন। সামান্য পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি কি করিয়া এতগুলি কাজ করিয়াছিলেন তাহা বিস্ময়ের বিষয়। রাজস্ব আদায় প্রভৃতি অনেক বিষয়ে আকবর শের শাহের নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন।

১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে শের শাহ কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করেন। এই সময় বারুদের আগুনে পুড়িয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। সাসারামে তাঁহার সমাধি-সৌধ আজিও সেকালের স্থাপত্য-শিল্পের পরিচয় দিতেছে।

হুমায়ুন শের শাহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান। পারস্যে যাইবার পথে অমরকোটে তাঁহার বিখ্যাত পুত্র আকবরের জন্ম হয় (১৫৪২)।

হুমায়ুন শিশুপুত্র আকবরকে তাঁহার এক ভ্রাতার নিকট রাখিয়া পারস্যের রাজার আশ্রয় লন। সেখানে যাইয়া তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। কিছুদিন পরেই কাবুল জয় করেন। শের শাহের মৃত্যুর পর তিনি দিল্লীর সিংহাসন পুনরায় অধিকার করিয়া লন। কিন্তু সিংহাসন লাভের কয়েক মাস পরেই গ্রন্থশালার সিঁড়ি হইতে পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু হয় (১৫৫৬)।

আকবর

আকবর যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তিনি মাত্র ১৫ বৎসরের বালক। কিন্তু তাঁহার শত্রুর অভাব ছিল না। অল্প বয়স্ক ও অনভিজ্ঞ হইলেও নিজের শক্তি ও বুদ্ধিবলে তিনি শত্রুদের দমন

করিতে ও সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হুমায়ুন দিল্লী ও আগ্রা ছাড়া বাবরের সাম্রাজ্যের কোন অংশই উদ্ধার করিতে পারেন নাই। উত্তর ভারতে তখন অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঐ সকল রাজ্যের রাজারা আকবরের আধিপত্য স্বীকার করিলেন না। শের শাহের বংশধর আদীল শাহ আকবরকে তাড়াইয়া দিবার জন্য তাঁহার হিন্দু সেনাপতি হিমুকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সহিত আকবরের বন্ধু ও সেনাপতি বৈরাম খাঁর পানিপথ-ক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়। হিমু পরাজিত ও নিহত হন। ইহাই পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পর ভারতে পাঠান আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল। এইরূপে আকবরকে নূতন করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে হইয়াছিল। এই কারণে তাঁহাকেই মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে।


আকবর

পানিপথের যুদ্ধের পর আকবর, যে সকল রাজা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন নাই ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সকলের রাজ্যই জয় করিয়া ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন। যাঁহারা অতুল বীরত্ব ও সাহসের সহিত আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের

মধ্যে রাণী দুর্গাবতী, রাণা উদয় সিংহ এবং চাঁদ সুলতানার নাম ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে।

আকবর মালব, গুজরাট, কাবুল, কান্দাহার, বালুচিস্থান, সিন্ধু, রাজপুতানা, বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা জয় করিয়া হিন্দুকুশ হইতে ব্রহ্মপুত্র এবং হিমালয় হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যেও তিনি খান্দেশ আক্রমণ করিয়া বুরহানপুর ও আমিরগড় দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন।

আকবরের গায়ের রং যদিও ফর্সা ছিল না, তাঁহার দেহ ছিল সুগঠিত এবং চেহারা ছিল রাজোচিত। তাঁহার প্রশস্ত স্কন্ধ, প্রশস্ত ললাট এবং উজ্জ্বল চক্ষু ছিল। চক্ষুর মণি ছিল কাল এবং পাতার লোমগুলি ছিল লম্বা কিন্তু ভ্রূরেখা ছিল ক্ষীণ। তাঁহার উপরের ঠোঁটের বামদিকে নাকের নীচে একটা তিল ছিল। বাম-পা ছিল একটু খোঁড়া। তিনি হাসিলে তাঁহার মুখ প্রায় অন্য প্রকার হইয়া যাইত এবং রাগিলে ভীষণ রকমের গাম্ভীর্য্যে ভরিয়া উঠিত। স্বভাবতঃ তাঁহার মুখে শান্ত, স্থির ও অকপট ভাব প্রকাশ পাইত। তাঁহার গলার স্বর ছিল উচ্চ। তিনি মূহূর্ত্তের জন্যও ভগবানকে ভুলিয়া যাইতেন না এবং বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াও ভগবানের কাছে নিজেকে ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র মনে করিতেন। সকল ধর্ম্মের ও সকল জাতির মধ্যে যাহা কিছু ভাল দেখিতেন তাহার সঙ্গেই তিনি নিজেকে যুক্ত করিতেন। তিনি কি দিনে কি রাত্রে খুব অল্পসময় নিদ্রা যাইতেন। তাঁহার সাহস ছিল অদম্য। তিনি উন্মত্ত হস্তীকে দমন করিতে পারিতেন, অশ্ব পৃষ্ঠে নির্ভয়ে তরঙ্গ-সঙ্কুল নদী-বক্ষে ঝাঁপাইয়া পাড়িতেন। তিনি বৎসরের মধ্যে নয় মাস নিরামিষ খাইতেন এবং জীবহত্যা পছন্দ করিতেন না।

মোগলদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এমন এক অখণ্ড ভারতের কল্পনা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল যেখানে মুসলমান, হিন্দু, জৈন, খৃষ্টান এবং পার্শী সকলে সমান অধিকারে বাস করিতে পারিবে। তিনি সকল ধর্ম্মমতকেই শ্রদ্ধা করিতেন।

আকবর বাল্যজীবনে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পান নাই। তিনি লেখাপড়া জানিতেন না বলিলেই হয়। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের স্পৃহা ছিল অত্যন্ত প্রবল। অবসরকালে জ্ঞানী, গুণী ও চিন্তাশীল পণ্ডিতদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। তিনি গুণীর আদর করিতেন। তাঁহার রাজসভায় অনেক গুণী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাদের বলা হইত নবরত্ন। তাঁহাদের মধ্যে সঙ্গীতজ্ঞ তানসেন, হাস্যরসিক বীরবল, সেনাপতি মানসিংহ, রাজস্ব-সচিব টোডরমল, কবি ফৈজী এবং ঐতিহাসিক আবুল ফজলের নাম ভারতে এখনও সুপরিচিত হইয়া আছে।

আকবর পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্মমতগুলিকে একই মহাধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য "দীন ইলাহী" নামে এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন। এই ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মের মূলনীতি লইয়া রচিত হইয়াছিল। ইহার মূল কথা হইল—ভক্তি সহকারে পরমপিতা জগদীশ্বরের উপাসনাই মুক্তির একমাত্র উপায়।

জাহাঙ্গীর

আকবরের মৃত্যুর পর যুবরাজ সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। জাহাঙ্গীর শিষ্টাচারী,

বিনয়ী ও কোমল-হৃদয় পুরুষ ছিলেন এবং সকল ধর্ম্মের প্রতি উদার ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে বিপরীত গুণের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিল। কোমলতা, স্নেহপরায়ণতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সহিত তাঁহার চরিত্রে নিষ্ঠুরতা ও চরম নৃশসংতা দেখিতে পাই। জীবন্ত মানুষের চর্ম্ম উৎপাটন করিতে দেখিয়াও তিনি বিচলিত হন নাই। আবার রাজ্যের দীনতম প্রজাও যাহাতে তাঁহাকে সহজে তাহাদের অভাব-অভিযোগ জানাইতে পারে সে জন্য তাঁহার ঘরে একটি ঘণ্টা রাখিয়াছিলেন। উহার সহিত একটি শিকল বাঁধিয়া তাহার আর একটি প্রান্ত রাস্তার ধারে প্রাসাদের দেয়ালে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। যে কেহ ঐ শিকল টানিয়া সম্রাটকে তাহার অভিযোগ জানাইতে পারিত।



জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীরের মুখমণ্ডল সর্ব্বদাই শান্ত ও গম্ভীর থাকিত। তাহার মধ্য হইতে যেন দম্ভ ও সব কিছুর প্রতি অবজ্ঞার একটা ভাব প্রকাশ পাইত। তাঁহার মুখের ভাব কখনও বদলাইত না। তিনি কখনও হাসিতেন না।

জাহাঙ্গীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য খুব ভালবাসিতেন। ফুল ছিল তাঁহার খুব প্রিয়। শিল্প, সাহিত্য ও চিত্রাঙ্কনের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি নিজে 'তুগলুক-ই-জাহাঙ্গীরী' নামে তাঁহার আত্মজীবনী লিখিয়াছিলেন।

শাহ্‌জাহান

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহ্‌জাহান দিল্লীর সম্রাট হইলেন। সম্রাট হইয়াই তাঁহার ভ্রাতা শাহরীয়ারের চক্ষু নষ্ট করিয়া দিলেন, এবং রাজপরিবারের অন্যান্য বহু রাজপুত্রকে বধ করিলেন।

টেরি, বার্ণিয়ে, টেভারনিয়ে, টমাস রো প্রভৃতি ইউরোপীয় পর্য্যটকগণ শাহ্‌জাহানকে বিলাসী, নিষ্ঠুর এবং আরামপ্রিয় সম্রাট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মনে হয় তাঁহারা শাহ্‌জাহানের প্রতি কিছুটা অবিচার করিরাছেন। তাঁহার জীবনে কোন কোন সময়ে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিলেও তাঁহার অনেক সদ্‌গুণ ছিল যাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার ন্যায়বিচার, প্রজাবাৎসল্য, উদ্যম ও উচ্চাকাঙ্খা তাঁহার দোষগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। গুজরাটে দুর্ভিক্ষের সময় তিনি প্রজাদিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।



শাহ্‌জাহান

হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিলেও শাহ্‌জাহান ধর্ম্ম বিষয়ে উদারতা প্রদর্শন করেন নাই। শাহ্‌জাহান ছিলেন অত্যন্ত ঐশ্বর্য্য ও জাঁকজমকপ্রিয়। আগ্রা ও দিল্লীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য তিনি সুন্দর সুন্দর সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আগ্রার তাজমহল তাঁহার পত্নীপ্রেম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তিনি চিত্রাঙ্কন ভালবাসিতেন এবং কবি ও পণ্ডিতদের সমাদর করিতেন।

ঔরঙ্গজেব

পিতা শাহ্ জাহানকে বন্দী করিয়া এবং দুই ভাইকে বধ করিয়া ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্যের আয়তন সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে ত্রিচীনপল্লী এবং পূর্ব্বে চট্টগ্রাম হইতে পশ্চিমে আফগানিস্থানের সীমা পর্য্যন্ত উহা বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এই চরম উত্থানের পরেই মোগল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়।


ঔরঙ্গজেব

ঔরঙ্গজেব ছিলেন ধর্ম্মপ্রাণ সম্রাট। ইসলাম ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি ঐ ধর্ম্মের নীতিগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। তিনি ৬ হইতে ৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কোরাণ পাঠ করিতেন। রমজানের মাসে তিনি উপবাস করিতেন। যে কাজ ইস্‌লাম ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ তাহা তিনি কখনও করিতেন না। নিয়মিত প্রার্থনার সময় তিনি প্রার্থনা করিতেন, যুদ্ধক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইত না। তাঁহার জীবন ছিল অনাড়ম্বর। সোনারূপার পাত্র তিনি ব্যবহার করিতেন না। নিজে টুপি তৈরী করিয়া ও কোরাণ নকল করিয়া যাহা পাইতেন তাহা দ্বারাই নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।

ঔরঙ্গজেবের সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা, ন্যায়পরায়ণতা ও শ্রমশীলতা ছিল অতুলনীয়। এত সংগুণ থাকা সত্ত্বেও ঔরঙ্গজেব রাজ্য শাসনে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। এত বড় সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্য একা পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না, তথাপি তিনি অপরের প্রতি নির্ভর করিতে পারিতেন না।

একজন বিদেশী ঔরঙ্গজেবকে তাঁহার ৭৮ বৎসর বয়সে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে ঔরঙ্গজেব আকারে ঈষৎ খর্ব্ব এবং কৃশ ছিলেন। বৃদ্ধত্বের জন্য তাঁহার দেহ সম্মুখদিকে নুইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার পাকা দাড়ি ছিল। তিনি ঐ বয়সে যষ্টির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া চশমার সাহায্য না লইয়া সহাস্যবদনে ওমরাহদের দরখাস্ত পাঠ করিয়া নিজ হাতে সহি করিয়া দিতেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মোগলসাম্রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তার লাভ করে। ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য জয় করেন এবং ত্রিচীনপল্লী ও তাঞ্জোর তাঁহার আধিপত্য মানিয়া লয়। তাঁহার মাতুল শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করেন। প্রায় সমগ্র ভারতে তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করিলেও ঔরঙ্গজেবের জীবিতকালেই ঐ সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। দাক্ষিণাত্যে মারাঠাবীর শিবাজী ঔরঙ্গজেবের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। ঔরঙ্গজেব কিছুতেই তাঁহাকে দমন করিতে পারেন নাই। তাঁহার হিন্দু-বিদ্বেষের এবং জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্ত্তনের ফলে হিন্দুরা অসন্তুষ্ট হইয়া ওঠে। রাজপুতগণ ও শিখেরা বিদ্রোহী হইল এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। এই সকল কারণে বৃদ্ধ সম্রাটের দেহ-মন ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আহমদনগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ঔরঙ্গজেবের অসহিষ্ণু নীতির ফলে যাহারা মোগল সাম্রাজ্যের শত্রুতে পরিণত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে মারাঠা ও রাজপুতগণ ছিল প্রধান। তাঁহার মৃত্যুর পর শিখগণও মোগলশক্তির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ওঠে।

মারাঠা—ঔরঙ্গজেবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল শত্রু ছিল মারাঠা জাতি। তাহারা বাস করিত দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব দিকে। যাঁহার প্রতিভাবলে মারাঠারা এক রণকুশল জাতিতে পরিণত হয় তাঁহার নাম শিবাজী। তিনি বিজাপুরের সুলতানের এক জায়গীরদারের পুত্র। বাল্যকালে লেখাপড়া না শিখিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি আনন্দ পাইতেন। মাতার মুখে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনিয়া তাঁহার মনে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য গঠনের বাসনা জাগিয়া ওঠে।

প্রথমে তিনি একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিলেন এবং সেনাপতি আফজল খাঁকে কৌশলে বধ করিলেন। তখন বিজাপুরের সুলতান তাঁহাকে কঙ্কন প্রদেশের স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। ক্রমে তিনি মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ঔরঙ্গজেব সম্রাট হইয়া মাতুল শায়েস্তা খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া শিবাজী শায়েস্তা খাঁকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেন, শায়েস্তা খাঁ জানালা দিয়া লাফাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। ইহার পরে ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে দমন করিবার জন্য বহু চেষ্টা করেন কিন্তু কিছুতেই পারিয়া উঠেন নাই। একবার তিনি শিবাজীকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বন্দী করিলেন কিন্তু শিবাজী কৌশলে পালাইয়া যান। শেষ পর্য্যন্ত ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজী 'ছত্রপতি'

উপাধি ধারণ করিলেন। ইহার পরে ছত্রপতি শিবাজী আর অধিক দিন বাঁচিলেন না। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শিবাজী একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। সামান্য এক জায়গীর-দারের পুত্র হইয়া তিনি এক বিশাল হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং মারাঠা জাতির ভিতর নূতন শক্তি আনিয়া দিয়াছিলেন। তিনি কেবলমাত্র কৌশলী যোদ্ধা ছিলেন না, তাঁহার শাসনব্যবস্থা ও শাসন-শৃঙ্খলাও ছিল চমৎকার। শিবাজীর দীক্ষাগুরু ছিলেন রামদাস স্বামী। সম্পদে বিপদে তিনি তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

রাজপুত—যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু হইলে ঔরঙ্গজেব মাড়বার দখল করিয়া লইলেন। তাঁহার আদেশে তাঁহার কর্ম্মচারীগণ জিজিয়া কর আদায় করিতে লাগিলেন। তিনি যশোবন্ত সিংহের বিধবা পত্নী মহামায়া ও পুত্র অজিত সিংহকে বন্দী করিলেন। রাজপুতগণ ঔরঙ্গজেবের এইরূপ নিষ্ঠুর আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল। যশোবন্ত সিংহের মন্ত্রীপুত্র দুর্গাদাস তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিলেন এবং রাজপুত জাতির গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দুর্গাদাস কৌশলে অজিত সিংহ ও তাঁহার মাতাকে দিল্লী হইতে মুক্ত করিলেন। মেবারের রাণা রাজসিংহ ও বহু রাজপুত বীর মাড়বারের বিপদে সাহায্য করিবার জন্য আগাইয়া আসিলেন। এইরূপে ঔরঙ্গজেবের কঠোর নীতির ফলে রাজপুতগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইল এবং এক দুর্দ্ধর্ষ শক্তিতে পরিণত হইল। ঔরঙ্গজেব বহু যুদ্ধ করিয়াও মাড়বার জয় করিতে পারেন নাই।

শিখ—শিখ ধর্ম্মের আদি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নানক। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরের নিকট নানকানা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। সকল

ধর্ম্মের প্রতিই তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার নিকট হিন্দু-মুসলমান ভেদ ছিল না। শিখেরা গুরুবাদে বিশ্বাসী। নানক ছিলেন তাহাদের প্রথম গুরু। নবম গুরু তেজবাহাদুর ঔরঙ্গজেবের আদেশে নিহত হন। তাঁহার পুত্র দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখদিগকে এক দুর্দ্ধর্ষ সামরিক জাতিতে পরিণত করেন এবং মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। শিখেরা তাঁহার শিক্ষায় মোগলদের পরম শত্রু হইয়া ওঠে।

প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের শক্তি বৃদ্ধি—ঔরঙ্গজেবের দুর্ব্বল ও সঙ্কীর্ণ নীতির ফলে রাজকার্য্যে শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল। রাজকার্য্যে অবহেলার জন্য তিনি কাহাকেও কোন দণ্ড দিতেন না। সেই জন্য রাজ্যের সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা ও ওমরাহগণের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দিতার সৃষ্টি হইয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ লাগিয়াই থাকিত। তাহাতে কেন্দ্রীয় শাসন আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ইহার সুযোগ লইয়া প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইলেন এবং ক্রমে তাঁহারা অনেকেই স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। এইরূপে দাক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা এবং অযোধ্যা স্বাধীন হইল। ইহাতে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পথ সুগম করিয়া দিল।

মোগল সাম্রাজ্যের পতন— আকবরের দূরদর্শিতা ও উদারনীতির ফলে তিনি যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন ঔরঙ্গজেবের অদূরদর্শিতা ও অসহিষ্ণু নীতির ফলে সেই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল।

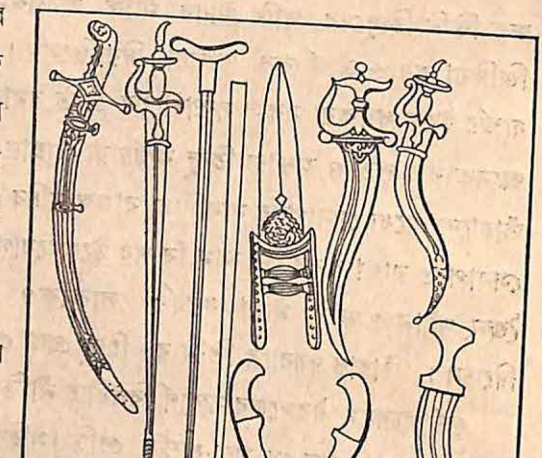
আকবর সকল সম্প্রদায়ের প্রজাকেই সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। মুসলমান ও অ-মুসলমানের প্রভেদ তুলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি

বুঝিয়াছিলেন প্রজাদের আনুগত্য লাভ করিতে না পারিলে সাম্রাজ্য স্থায়ী হইতে পারে না। ভারতে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল বেশী, সুতরাং হিন্দুদের ঘৃণা করিলে তাহাদের আনুগত্য লাভ করা যাইবে না। সেই জন্য তিনি হিন্দুদের প্রতি উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং জিজিয়া কর ও তীর্থ কর তুলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি নিজে সকল ধর্ম্মের উর্দ্ধে থাকিয়া সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমান ব্যবহার করিতেন। অনেক রাজপুত ও অন্যান্য হিন্দু কর্ম্মচারী তাঁহার সভাসদ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সেনাপতি মানসিংহ, রাজস্ব সচিব টোডরমল এবং কবি ও সেনাপতি রাজা বীরবলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্ম্মের লোককেও তিনি যথাযথ মর্য্যাদা দিতেন। তাঁহার দরবারে তিনি বহু হিন্দু প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে ঔরঙ্গজেব সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে অন্য ধর্ম্মের প্রতি সহিষ্ণুতা ইসলাম বিরুদ্ধ। তিনি হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর পুনঃস্থাপিত করেন। তিনি বহু হিন্দু কর্ম্মচারীকে কার্য্য হইতে অপসারিত করেন। যে রাজপুতদের সাহায্যে আকবর তাহার সাম্রাজ্যকে দৃঢ় করিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজেব তাহাদেরই প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে লাগিলেন। মাড়বারের রাজা যশোবন্ত সিংহের বিধবা পত্নীর প্রতি ঔরঙ্গজেব যে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে রাজপুতগণ আকবরের সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিল ঔরঙ্গজেব তাহাদের শত্রুতে পরিণত করিলেন। তাঁহার অসহিষ্ণু নীতির ফলে সর্ব্বত্র হিন্দুরা ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। মথুরায় জাঠগণ ও বুন্দেলার রাজা বিদ্রোহী হইলেন। শিখগুরু তেজবাহাদুরকে হত্যা করার কি ফল হইয়াছিল তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

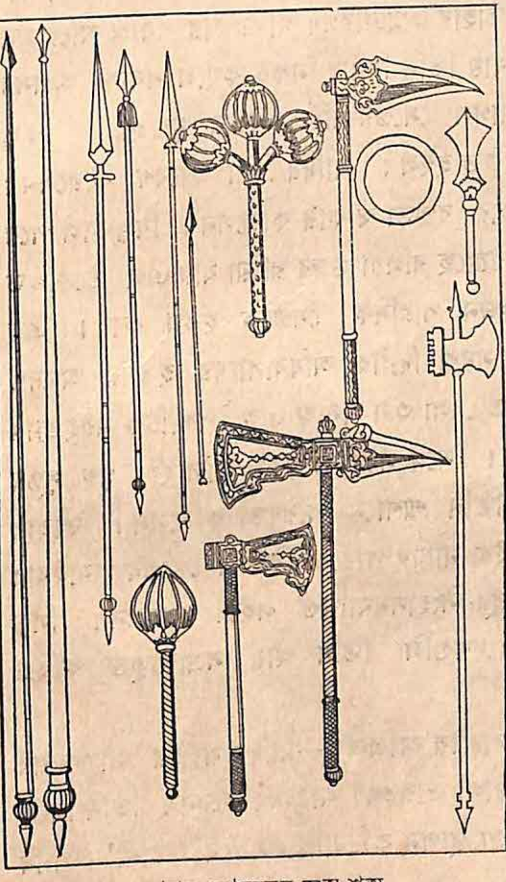
দাক্ষিণাত্যে মারাঠাগণ শিবাজীর নেতৃত্বে তাঁহার চিরশত্রু হইয়া ওঠে। এইরূপে ঔরঙ্গজেবের অদূরদর্শিতার জন্য সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িল এবং মোগল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইল।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের আরও অনেক কারণ ছিল। মোগল সাম্রাজ্য সম্রাটদের সামরিক শক্তির উপরই গড়িয়া উঠিয়াছিল। মোগল সৈনিকদের সামরিক দক্ষতার অভাব না থাকিলেও উহা ত্রুটি বর্জ্জিত ছিল না। নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র ছিল কিন্তু সেনাবাহিনী সংখ্যায় ছিল বিপুল এবং সেইজন্য উহাদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন ছিল। সম্রাটদের চমকপ্রদ সামরিক অভিযান এবং শিবিরের জাঁকজমক সৈনিকদের দক্ষতা নষ্ট করিয়া দিত। উহার ফলে সৈনিকেরা উচ্ছৃঙ্খল ও



মোগল আমলের অস্ত্র-শস্ত্র

বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের সাহস এবং দ্রুততার সহিত কাজ করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছিল। এই সকল ত্রুটির ফল ঔরঙ্গজেবের সময় বেশী প্রকাশ পাইয়াছিল। সেইজন্য মোগলদের বিপুল বাহিনী শিবাজীর হাল্কা অশ্বারোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে পারিয়া উঠিত না।



মোগল আমলের অস্ত্র-শস্ত্র

মোগল সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল বিশাল। একস্থান হইতে অন্য স্থানে সৈন্যচলাচলের পথঘাট এই বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষার উপযোগী ছিল না। সেইজন্য সম্রাটগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ দেখা দিল। তখন এই কারণেই সে বিদ্রোহ দমন করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল।

নাদির শাহের আক্রমণ—মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের সর্ব্বশেষে কারণ হইল বিদেশীদের আক্রমণ। মোগল

সম্রাটদের দুর্ব্বলতার ফলে যখন তাঁহাদের সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল সেই সময়ে পারস্যের পরাক্রান্ত রাজা নাদির শাহ্ আসিয়া ভরতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। দিল্লীর সম্রাটেদের এত অধঃপতন হইয়াছিল যে অলস সম্রাট ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ আত্মরক্ষার পর্য্যন্ত আয়োজন করিলেন না। বিনা বাধায় তিনি দিল্লীর নিকট কর্ণাল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এইখানে মোগল সৈন্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। কিন্তু তাহারা ভীষণভাবে পরাজিত হইল। নাদির দিল্লী প্রবেশ করিলেন। সম্রাট বাধ্য হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কিছুকাল পরে দিল্লীতে নাদিরের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া গুজব রটিয়া যায় এবং উত্তেজিত দিল্লী-অধিবাসীরা কয়েকজন পারসিক সৈন্যকে হত্যা করে। এই সংবাদে নাদির ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত দিল্লীর অধিবাসীদের হত্যার অ্যাদেশ দেন। সকাল ৮টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত এক পৈশাচিক নরহত্যার তাণ্ডবলীলা চলিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া গৃহ লুণ্ঠন করিয়া দিল্লী নগরীকে তিনি শ্মশানে পরিণত করিলেন। তাহার পর অগণিত ধনসম্পদ লইয়া নাদির পারস্যে ফিরিয়া গেলেন। যাইবার সময় শাহজাহানের ময়ুর-সিংহাসনখানিও লইয়া গেলেন। সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরস্থ প্রদেশগুলি তিনি স্বীয় সম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন।

আহম্মদ শাহ্ আবদালীর আক্রমণ—নাদির শাহের আক্রমণের পরেই আহম্মদ শাহ্ আবদালী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি নিজে আফগানিস্থানে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং 'দুরানী' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। ভারতের ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তিনি ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মোট নয় বার ভারত আক্রমণ করিয়া-

ছিলেন। চতুর্থবার আক্রমণ করিয়া তিনি দিল্লী অধিকার করেন। আবার দিল্লীর রাজপথ নররক্তে প্লাবিত হইল। তদুপরি লুণ্ঠন ও গৃহদাহ দিল্লীর অবস্থা শোচনীয় করিয়া তুলিল। ইহার ফলে পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের কাঠামো একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মোগল শাসনপদ্ধতি—যদিও মোগল সম্রাটগণ স্বৈরাচারী ছিলেন এবং তাঁহাদের শাসন-ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত, তথাপি বিভিন্ন শাসন-কার্য্যের সুবিধার জন্য তাঁহারা বহু রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন। শাসন-সংক্রান্ত বিষয়গুলি ছয়টি বিভাগে বিভক্ত ছিল, যথা :— (১) সম্রাটের পারিবারিক বিভাগ :—এই বিভাগের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীকে বলা হইত 'খান-ই-সামান'। সম্রাটের প্রাসাদ ও রাজ-পরিবার সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপারের ভার ছিল তাঁহার উপর ; (২) রাজস্ব বিভাগ :—এই বিভাগ পরিচালনা করিতেন 'দেওয়ান' বা রাজস্ব সচিব ; (৩) সৈনিকদের ব্যয় ও হিসাব রক্ষার বিভাগ :—এই বিভাগের প্রধান ছিলেন 'মীর বক্‌সী' বা সমর সচিব ; (৪) বিচার বিভাগ :—এই বিভাগটি ছিল প্রধান কাজিরঅধীনে ; (৫) জনসাধারণের নীতি পরিদর্শক বিভাগ :—এই বিভাগের ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন 'মুহতাসিব'। ইসলাম ধর্ম্মের নীতিগুলি মুসলমানেরা পালন করেন কিনা তিনি সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতেন ; (৬) ধর্ম্মের নামে অর্পিত সম্পত্তি বা প্রদত্ত অর্থ তদারককারী বিভাগ :—এই বিভাগটির কর্ত্তা ছিলেন 'সদর-উস্-সুদুর'। তিনি ধর্ম্মের নামে দান করা অর্থ ও সম্পত্তির তত্ত্বা-বধান করিতেন।

বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করা সহজ কার্য্য নহে। সেই জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যকে কতকগুলি সুবায় বা প্রদেশে বিভক্ত করা হইয়াছিল।

প্রত্যেক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন 'সিপাহ সলার' বা সামরিক শাসনকর্ত্তা। তাঁহাকে 'সুবাদারও' বলা হইত। তিনি প্রদেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দায়ী থাকিতেন। প্রত্যেক প্রদেশ আবার কতকগুলি 'সরকারে' বা জিলায় বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সরকারের শাসনভার ছিল 'ফৌজদার'এর উপর। তিনি জেলার শাসনকার্য্য যাহাতে নিরুপদ্রবে পরিচালিত হইতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। সৈন্যবাহিনীর তিনি অধিনায়কও ছিলেন। 'কোতোয়াল'গণ জেলার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন। তাঁহারা গুপ্তচরের সাহায্যে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন।

অন্যান্য প্রাদেশিক কর্ম্মচারীর মধ্যে ছিলেন দেওয়ান বা প্রধান অর্থসচিব, কাজি বা বিচারক, ধর্ম্মসচিব বা সদর, আমিল বা রাজস্ব আদায়কারী, বিতিক্‌চি বা রাজস্বের হিসাবরক্ষক এবং জোতদার বা কোষাধ্যক্ষ। কর নির্দ্ধারণের জন্য সমগ্র জমি জরিপ করিয়া কৃষির অবস্থানুসারে জমিকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল। কৃষকদিগকে মোট ফসলের এক তৃতীয়াংশ কর দিতে হইত। কর অর্থ বা ফসলে দেওয়া চলিত। রাজস্ব আদায়ের জন্য সরকারগুলিকে কতকগুলি পরগণায় ভাগ করা হইয়াছিল। কয়েকটি গ্রামের সমষ্টিকে পরগণা বলা হইত।

মোগল সম্রাটদের শাসনপদ্ধতি আলোচনা করিলে দেখা যায় তাঁহাদের শাসন ব্যবস্থার অনেক কিছু কোন না কোনরূপে আমাদের দেশের বর্ত্তমান শাসনব্যবস্থার মধ্যে রহিয়াছে। এমন কি কোন কোন ব্যবস্থার সঙ্গে বেশ সাদৃশ্য রহিয়াছে। কোন কোন কর্ম্মচারীর নাম মাত্র বদলাইয়াছে। সুবাদারের স্থানে এখন আছেন রাজ্যপাল, আর ফৌজদারের স্থানে আছেন ম্যাজিষ্ট্রেট। প্রধান কাজির নাম হইয়াছে জজ। কোতোয়াল আর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্টের কাজের

মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। এখনও থানাকে কোতোয়ালী বলা হয়। আমিল বা রাজস্ব-আদায়কারীকে এখন আমরা বলি কালেক্টর।

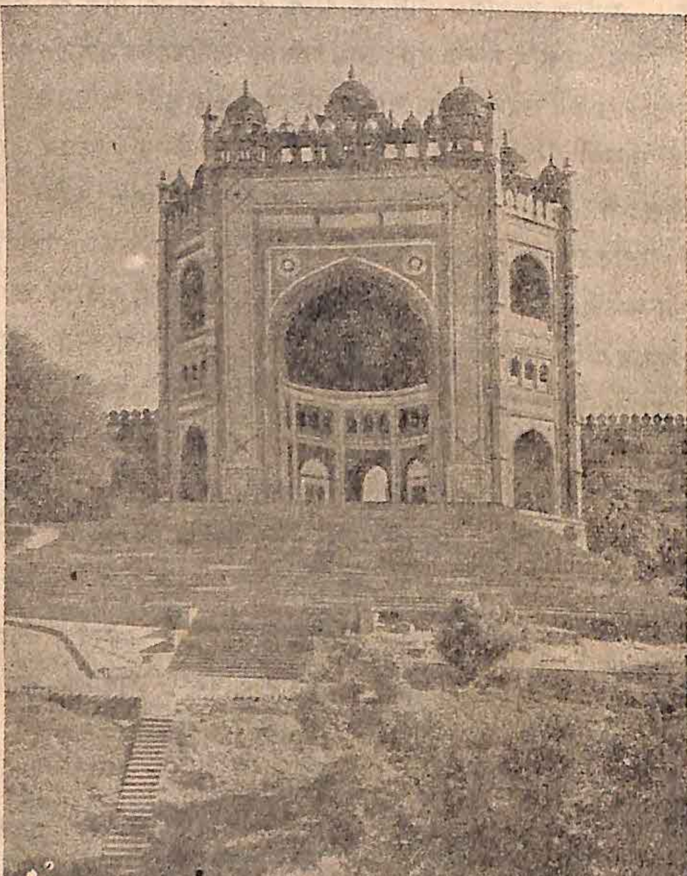
কিন্তু এতগুলি সাদৃশ্য থাকিলেও বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের সহিত পার্থক্যও আছে অনেক। তখন প্রদেশ-শাসক বা সুবাদার প্রভৃতি প্রধান কর্ম্মচারী-দের চাকুরী নির্ভর করিত সম্রাটের অনুগ্রহের উপর। এখন সেরূপ হইতে পারে না। তখনকার দিনে শাসনকার্য্য এত জটিল ছিল না। সুতরাং কর্ম্মচারীদের কাজও কম ছিল। ইহা ছাড়া কর্ম্মচারীদের মধ্যে ক্ষমতা এমন ভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যাহাতে প্রদেশ-শাসকের ক্ষমতা সংযত রাখিতে পারা যায়। যেমন প্রত্যেক প্রদেশে দেওয়ানের উপর রাজস্বের ভার দেওয়া হইয়াছিল। সুবাদারের হস্তে অর্থ ও শাসনভার দেওয়ার যথেষ্ট বিপদ ছিল। সুতরাং সুবাদার ও দেওয়ান পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। ফলে একজন যদি সম্রাটের আনুগত্য রক্ষা করিয়া চলিতেন তাহা হইল তাঁহার বিরোধিতা করিবার সুবিধা অপরে পাইতেন না।

প্রত্যেক রাজকর্ম্মচারীদের মনসব দেওয়া হইত—অর্থাৎ তাঁহাকে পদগৌরব ও অর্থ দেওয়া হইত। উহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে সামরিক কাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য সরবরাহ করিতে হইত। তাঁহারা ছিলেন সরকারের সৃষ্ট অভিজাত সম্প্রদায়।

মোগল আমলের সংস্কৃতি—মোগলযুগে হিন্দু ও মুসলমান উপাদানের সংমিশ্রণে এক নূতন সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্থাপত্য শিল্প, চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীতে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত প্রভাব নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছিল। আকবর ফতেহপুর সিক্রিতে অনেকগুলি প্রাসাদ ও মর্ম্মরসৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ফতেহপুর সিক্রির

৪

বুলান্দ-দরজা, যোধবাঈর প্রাসাদ, সিকান্দ্রায় তাঁহার নিজ সমাধি মন্দির

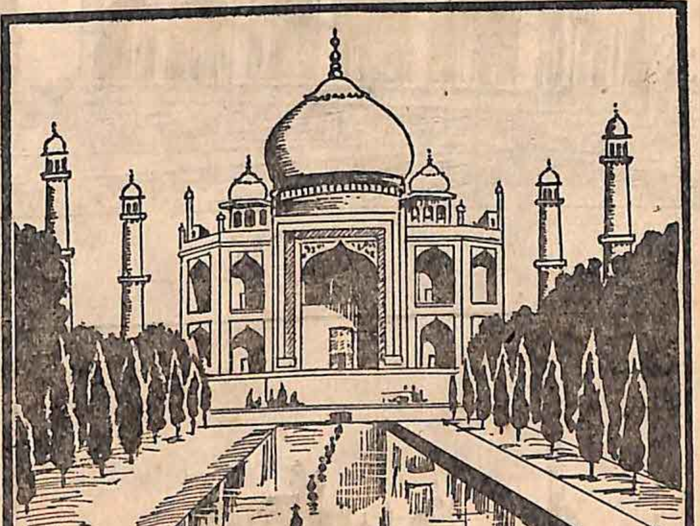


বুলান্দ-দরজা

এবং আগ্রার দুর্গ আকবরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। শাহ্‌জাহান দিল্লী ও আগ্রায় যে সকল সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সে গুলি কারুকার্য্যে ও জাঁকজমকে

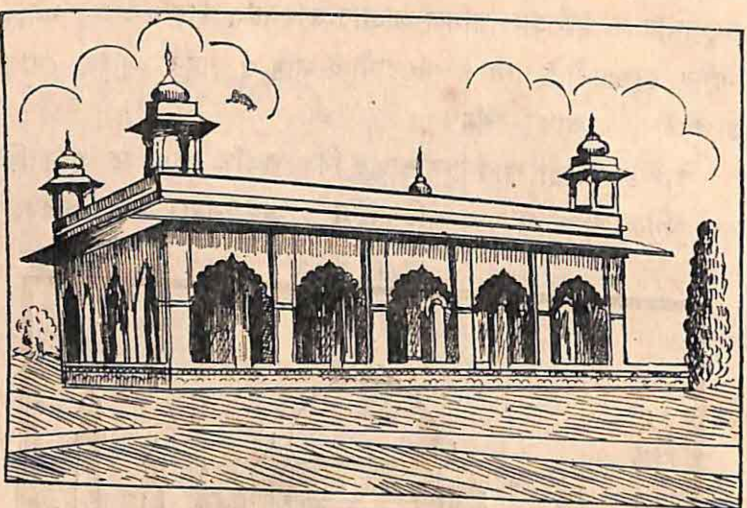
অতুলনীয়। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আগ্রার তাজমহল তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। দিল্লীর দেওয়ানী-ই-খাস্ ও দেওয়ানী-ই-আম্ ও জাম্-ই-মস্জিদ মোগল স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন।

স্থাপত্য শিল্পের ন্যায় চিত্রশিল্পেও মিশ্র পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল এবং অপূর্ব্ব উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে চীন, ভারত, ও

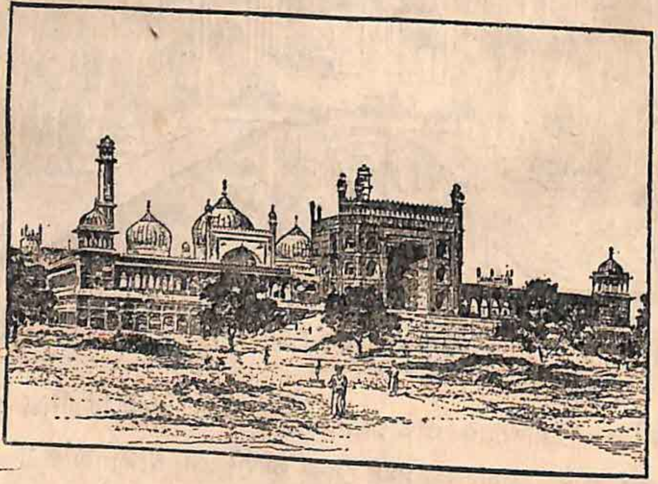


তাজমহল (আগ্রা)

পারসীক চিত্রশিল্পের প্রভাবে ভারতে এক নূতন চিত্রশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। আকবরের সময় সৈয়দ আলী এবং খাজা আব্দুস সামাদ মোগল যুগের চিত্রকলার গোড়াপত্তন করেন। আকবরের সভায় বহু



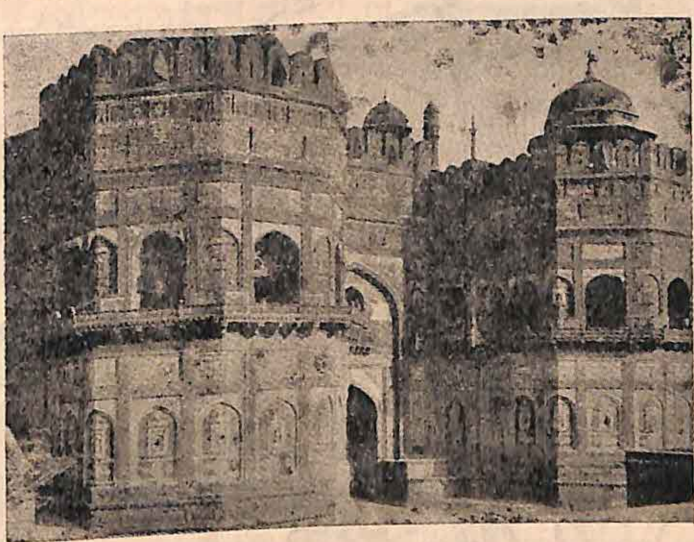
দেওয়ান-ই-খাস্ (দিল্লী)



জাম্-ই-মস্জিদ (দিল্লী)

হিন্দু চিত্রশিল্পী ছিলেন। জাহাঙ্গীর স্বয়ং ঐ শিল্পের অনুরাগী ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের সময় ঐ শিল্প প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়।

সঙ্গীতেও মোগল সম্রাটদের অনুরাগের অভাব ছিল না। হুমায়ুনের সঙ্গীতে জ্ঞান ছিল। প্রায় সকল মোগল সম্রাটই সঙ্গীত চর্চ্চায় উৎসাহ দান করিতেন। আকবরের সভায় বহু সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহাদের



আগ্রার দুর্গ

মধ্যে তানসেনের নাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। মালবরাজ রাজ-বাহাদুর হিন্দী-সঙ্গীতে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মোগলদের সময় অনেক প্রকার বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল।

মোগল শাসনকাল ভারতে শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ সুতরাং এই সময়ে সাহিত্যের উন্নতি হওয়া ছিল স্বাভাবিক। সম্রাটগণ অনেকেই হয় নিজেরা সাহিত্যিক ছিলেন, না হয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

জাহাঙ্গীর স্বয়ং সাহিত্যিক ছিলেন এবং নিজের জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। এই সময় পারস্য ও হিন্দী সাহিত্যে বহু গ্রন্থ লেখা



মোগল আমলের বাদ্যযন্ত্র

হয়। আকবর-নামা ও আইন-ই-আকবরির লেখক আবুল ফজল আকবরের বন্ধু ছিলেন। আকবরের আদেশে মহাভারত, রামায়ণ ও অথর্ব্ব বেদ পারস্য ভাষায় অনুদিত হয়। হিন্দিভাষায় তুলসীদাস তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ রাম-চরিত-মানস রচনা করেন। ইহাই তুলসী-দাসের রামায়ণ নামে পরিচিত আগ্রার হিন্দী কবি সুরদাস তাঁহার কাব্যগ্রন্থ সুর-সাগর রচনা করেন। বাংলায় কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, ঘনরাম প্রভৃতি তাঁহাদের অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে বাংলা সাহিত্যে স্বর্ণযুগ আনিয়াছিলেন। রামদাস ও তুকারাম মারাঠা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এই সময় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রসারলাভ করে। উত্তর ভারতে বল্লভাচার্য্য ও বাংলায় শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। মীরাবাঈ তাঁহার ভক্তিমূলক ভজন গানগুলি রচনা করিয়া কৃষ্ণভক্তির পরিচয় দেন। এই সময়ের ধর্ম্ম আন্দোলনের মধ্যেও হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধনের একটা চেষ্টা ছিল।

রাজদূত সার টমাস রো—মোগল রাজত্বকালে বহু ইউরোপীয় বণিক্ ও পর্য্যটক ভারতে আগমন করেন। ইংলণ্ডের রাজা সার টমাস রো নামে একজন রাজদূতকে একখানি পত্র ও উপহার-সামগ্রী দিয়া ইংরাজ বণিকদের বাণিজ্যে সুবিধা লাভ করিবার জন্য জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রেরণ করেন। রো তিন বৎসর ভারতে ছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সময় পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরাজ ও ফরাসী বণিকগণ ভারতের সহিত বাণিজ্য করিতে আসে এবং এ দেশে নানা স্থানে তাহাদের কুঠী স্থাপন করে।



টমাস রো

ভারতবর্ষও তখন এশিয়া এবং ইউরোপের সহিত কিছু কম বাণিজ্য করিত না। স্থল ও জল উভয় পথেই ভারতের মাল বাহিরে রপ্তানী করা হইত। বাণিজ্যের জন্য দুইটি স্থলপথ

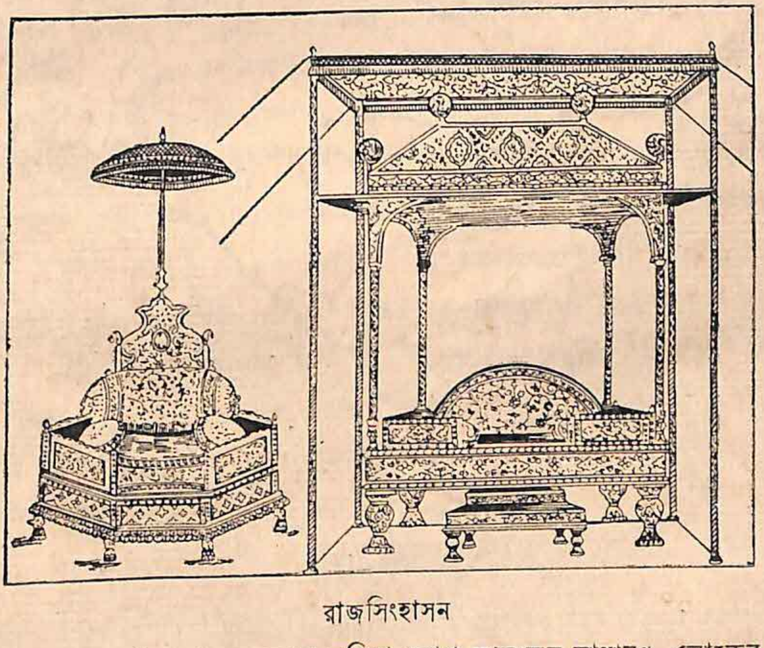
ব্যবহৃত হইত। একটি লাহোর হইতে কাবুল, আর একটি মুলতান হইতে কান্দাহার। বাণিজ্যের পক্ষে জলপথই ছিল সুবিধাজনক। ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব্ব উপকূলে বহু বন্দর ছিল, যেমন সুরাট, গোয়া, কোচিন, কালিকট, মসুলিপট্টম। বাংলাদেশে সাতগাঁও, চট্টগ্রাম এবং সোনারগাঁও বড় বন্দর ছিল।

বিদেশী পর্য্যটকদের বিবরণ—মোগলদের রাজত্বকালে যে সকল ইউরোপীয় পর্য্যটক এ দেশে আসিয়াছিলেন তাঁহারা অনেকে তখনকার ভারতবর্ষের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল পর্য্যটকদের মধ্যে ইংরাজ রাজদূত হিসাবে জাহাঙ্গীরের দরবারে আসিয়াছিলেন সার টমাস রো। ফরাসী পর্য্যটক টেভার্নিয়ে এবং বার্নিয়ে এ দেশে আসিয়াছিলেন ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে। তাঁহাদের লিখিত বিবরণ, ইউরোপীয় বাণিজ্য-কুঠিগুলির দলিলাদি, বাবর এবং জাহাঙ্গীরের আত্মচরিত, আবুল ফজলের লেখা আকবরের রাজত্বের ইতিহাস আইন-ই-আকবরি এবং সমসাময়িক প্রাদেশিক সাহিত্য হইতে মোগল সম্রাটদের দরবার ও প্রাসাদ-জীবন এবং সাধারণ লোকদের জীবনযাত্রা ও আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি অনেক বিষয় আমরা জানিতে পারি।

সার টমাস রো'র বিবরণ হইতে জাহাঙ্গীরের দৈনন্দিন জীবনের একটি পূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীর প্রত্যূষে উঠিয়া অনেকক্ষণ নিজ কক্ষে বসিয়া প্রার্থনা করিতেন। তাহার পর দর্শন দিবার জানালায় আসিয়া সমবেত প্রজাদের দর্শন দিতেন। ঐ জানালাকে বলা হইত 'ঝারোখা'। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দুই ঘণ্টা ঘুমাইতেন। ঘুম হইতে উঠিয়া আহার করিতেন। দ্বিপ্রহরে ঝারোখার সামনে বসিয়া হাতী এবং অন্যান্য পশুর লড়াই দেখিয়া

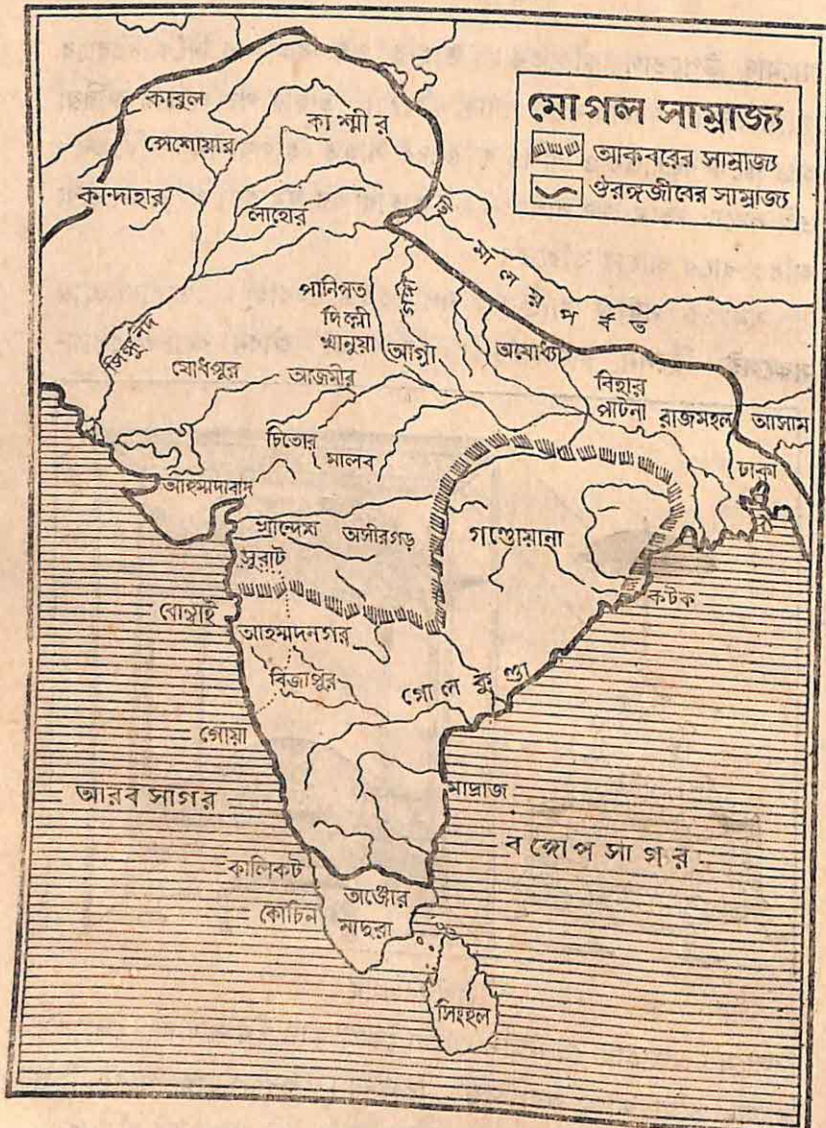
আমোদ উপভোগ করিতেন। তাহার পর বিকালের দিকে দরবারে আসিতেন। দরবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিত। তাহার পর আহার করিয়া অন্য কক্ষে বন্ধুবান্ধব ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত কালযাপন করিতেন। এই সময়ে তিনি মদ খাইতেন। তাহার পর ঘুমাইয়া পড়িতেন এবং অধিক রাত্রে আহার করিতেন।

ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বলা হইত ওমরাহ্। তাঁহারা প্রায় সকলেই ছিলেন রাজকর্ম্মচারী। তাঁহাদের জীবন কাটিত ভোগ-



রাজসিংহাসন

বিলাসে। তাঁহারা যে সম্মান সুবিধা ভোগ কারতেন সাধারণ লোকের ভাগ্যে তাহা লাভ করা সম্ভব ছিল না। ওমরাহ্‌দের পরেই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তাঁহারা নিজ নিজ পদ ও বৃত্তি অনুসারে চলিতেন।


মোগল সাম্রাজ্য
আকবরের সাম্রাজ্য
ঔরঙ্গজীবের সাম্রাজ্য
কাবুল
কাশ্মীর
পেশোয়ার
কান্দাহার
লাহোর
পানিপত
দিল্লী
খানুয়া
আগ্রা
অযোধ্যা
বিহার
পাটনা
রাজমহল
আসাম
ঢাকা
সিন্ধুনদ
যোধপুর
আজমীর
চিতোর
মালব
আহম্মদাবাদ
খান্দেশ
অসীরগড়
গণ্ডোয়ানা
সুরাট
কটক
বোম্বাই
আহম্মদনগর
বিজাপুর
গোলকুণ্ডা
গোয়া
আরব সাগর
মাদ্রাজ
বঙ্গোপসাগর
কালিকট
তাঞ্জোর
কোচিন
মাদুরা
সিংহল

যাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন তাঁহারা সাধারণতঃ পরিমিত জীবন যাপন করিতেন। শ্রমিকদের ছিল শোষিত জীবন। অধিকাংশ সময় তাহাদের কষ্টে কাটাইতে হইত। অল্প উপার্জ্জন ও রাজকর্ম্মচারীদের উৎপীড়ন এই দুই প্রকার অত্যাচার তাহাদের সহ্য করিতে হইত। তাঁতী ও অন্যান্য কারিকর তাহাদের পরিশ্রম অনুযায়ী মুনাফা পাইত না। কিন্তু ধনী ও ওমরাহ্‌গণ সকল সময়ই উৎকৃষ্ট দ্রব্যের আদর করিতেন বলিয়া তাহাদের উৎপন্ন শিল্পবস্তুগুলির উৎকর্ষতা তাহারা বজায় রাখিত। কৃষকদেরও জায়গীরদারদের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইত। এমন কোনও স্থান ছিল না যেখানে উৎপীড়িত কৃষক ও শ্রমিকেরা তাহাদের অভিযোগের প্রতিকার পাইত। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য অল্পবিস্তর এই যুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখা যাইত। একটি কথা জানিয়া তোমাদের খুব ভাল লাগিবে। ধনধান্য-ভরা শস্য-শ্যামলা তখনকার বাংলা এবং উহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া বার্ণিয়ে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

মোগলদের সময় সাধারণ লোক যে প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাস করিত না তাহা নিশ্চিত। কারণ তখন জিনিষপত্রের দাম কম থাকিলেও তাহাদের আয়ও ছিল খুবই কম।

অনুশীলনী

১। বাবরের পরিচয় দাও। কি প্রকারে তিনি ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন?

২। তাঁহার পুত্রের নাম কি? তিনি কি ভাবে সাম্রাজ্য হারাইয়াছিলেন?

৩। শের শাহের শাসনপ্রণালী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৪। কোন্ যুদ্ধে ও কাহাকে পরাজিত করিয়া আকবর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন ? তাঁহার চরিত্র বর্ণনা কর।

৫। তাঁহার রাজসভায় যে সকল গুণী ব্যক্তি ছিলেন তাঁহাদের নাম কর।

৬। আকবরের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নাম কি ? এই নূতন ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি ছিল ?

৭। জাহাঙ্গীরের চরিত্র বর্ণনা কর।

৮। শাহ্‌জাহানের সময় কোন্ কোন্ বিদেশী পর্য্যটক এ দেশে আসিয়াছিলেন ? তাঁহারা শাহ্‌জাহান সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন ? শাহ্‌জাহানের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি কি ?

৯। ঔরঙ্গজেবের চরিত্র বর্ণনা কর।

১০। আকবর ও ঔরঙ্গজেবের সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের সীমানা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল ?

১১। নাদির শাহের দিল্লী আক্রমণের বিষয় বর্ণনা কর।

১২। আহম্মদ শাহ আবদালি কে ছিলেন ? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান ?

১৩। মোগল আমলের শাসন প্রণালী বর্ণনা কর। ভারতের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর সহিত উহার তুলনা কর।

১৪। মোগল আমলে স্থাপত্য, চিত্রশিল্প ও সঙ্গীতের কি উন্নতি হইয়াছিল ? উহাদের বৈশিষ্ট্য কি ছিল ?

১৫। সার টমাস রো কেন এ দেশে আসিয়াছিলেন ? তিনি জাহাঙ্গীরের সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন ?

১৬। বিদেশী পর্য্যটকদের বিবরণ হইতে মোগল আমলে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে কি জানিতে পারা যায় ?

চতুর্থ অধ্যায়

ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর বিদ্রোহ

ইংলণ্ডের ইতিহাসে টিউডর বংশের রাজত্বকাল একটি স্মরণীয় যুগ। এই সময়ে ইংরাজ জাতির প্রাণশক্তি ও কর্ম্মশক্তি বহুদিকে নিয়োজিত হইয়াছিল। ইহার ফলে যে সর্ব্বতোমুখী উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহাই ইংরাজ জাতিকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে লইয়া গিয়াছিল। নবজাগরণ, ধর্ম্মসংস্কার, বাণিজ্যের প্রসার ও সমুদ্র জয়ের দুঃসাহসিকতা ইংরাজ জাতির উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছিল এবং নানা বিষয়ে যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছিল। এই সকল অভিনব পরিবর্ত্তন দেশের রূপ বদলাইয়া দিল। সমাজে ব্যবসায়ী, বণিক্ এবং জমির মালিকগণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইল। জমির মালিকগণ জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া লাভবান হইতে লাগিলেন। ইংরাজ জাতি উপনিবেশ ও বাণিজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিল। দেশ শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরিয়া উঠিল। রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য লোকের মনে আগ্রহ জন্মিল। এতকাল রাজা ও সামন্তদের অধীনতা স্বীকার করিয়া চলাই ছিল তাহাদের অভ্যাস। এখন ঐ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া নিজেদের অধিকার স্থাপনের ইচ্ছা তাহাদের মনে স্থান পাইল।

কিন্তু এই রাজনৈতিক অধিকার স্থাপন করিবার জন্য ইংরাজ জাতিকে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ইহাই ইংলণ্ডের ইতিহাসে সপ্তদশ শতাব্দীর 'ইংরাজ বিদ্রোহ' নামে পরিচিত।

টিউডর বংশের রাজগণ অতিশয় শক্তিশালী ছিলেন বলিয়া পূর্ব্বে বর্ণিত পরিবর্ত্তনগুলি সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের পরবর্ত্তী ষ্টুয়ার্ট বংশের রাজগণ ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের লোক—সুতরাং বিদেশী। ইংরাজদের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতির অভাব ছিল এবং তাঁহারা শাসক হিসাবে সুদক্ষ ছিলেন না। নব পরিবর্ত্তনের ফলে ইংলণ্ডের জাতীয় সভা পার্লামেণ্টের শক্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। টিউডর রাজগণ যথেচ্ছাচারী হইলেও পার্লামেণ্টকে উপেক্ষা করেন নাই। কিন্তু ষ্টুয়ার্টগণ পার্লামেণ্টের অধিকার মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলেন। পার্লামেণ্টের নিকট উহা অসহ্য হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। এইরূপে পার্লামেণ্ট ও রাজার মধ্যে ইংলণ্ডে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।



প্রথম জেমস্

কেন এই বিদ্রোহ হইল তাহা বুঝিতে হইলে ষ্টুয়ার্টদের এবং তাঁহাদের শাসননীতির দোষক্রটী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানা আবশ্যক। তাহাই এবার বলিতেছি। ষ্টুয়ার্ট বংশের রাজারা স্কটল্যাণ্ডে রাজত্ব করিতেন। টিউডর বংশের রাণী এলিজাবেথ বিবাহ করেন নাই। তাঁহার কোন পুত্র না থাকায় তাঁহার মৃত্যুর

পর ষ্টুয়ার্ট বংশের প্রথম জেমস্ উত্তরাধিকার সূত্রে ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ করেন। তিনি তখন স্কটল্যাণ্ডে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ করিবার পর তিনি উভয় দেশেরই রাজা হইলেন। এই বংশের মোট চার জন রাজা ইংলণ্ডে রাজত্ব করেন। তাঁহাদের নাম হইল প্রথম জেম্‌স, প্রথম চার্ল্‌স, দ্বিতীয় চার্ল্‌স ও দ্বিতীয় জেম্‌স।



প্রথম চার্ল্‌স

ষ্টুয়ার্টরাজগণ বিশ্বাস করিতেন যে রাজার ক্ষমতা ঈশ্বর-প্রদত্ত। সেই শক্তির বলে তাঁহারা পার্লামেণ্টকে অগ্রাহ্য করিয়া রাজ্য শাসন করিতে পারেন, বিনা বিচারে যে কোন লোককে দণ্ড দিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা পার্লামেণ্টকে কোন আমলই দিতেন না। ইহা ছাড়া তাঁহারা ছিলেন প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে। অথচ টিউডর বংশের রাণী এলিজাবেথ ইংলণ্ডের যে ধর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়া দেন তাহা প্রায় প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মেরই অনুরূপ। সুতরাং ইংরাজগণ যে ধর্ম্ম মানিয়া লইয়াছে ষ্টুয়ার্টরাজগণ সে ধর্ম্মকে সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রত্যেক বিষয়ে ষ্টুয়ার্ট-রাজগণ জনমত উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের ইচ্ছামত রাজশক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। পার্লামেণ্ট রাজাদের এই যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া নিজেদের অধিকার রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইল।

এইরূপে ষ্টুয়ার্টরাজাদের সহিত পার্লামেণ্টের বিবাদ আরম্ভ হইল।



দ্বিতীয় চার্ল্‌স

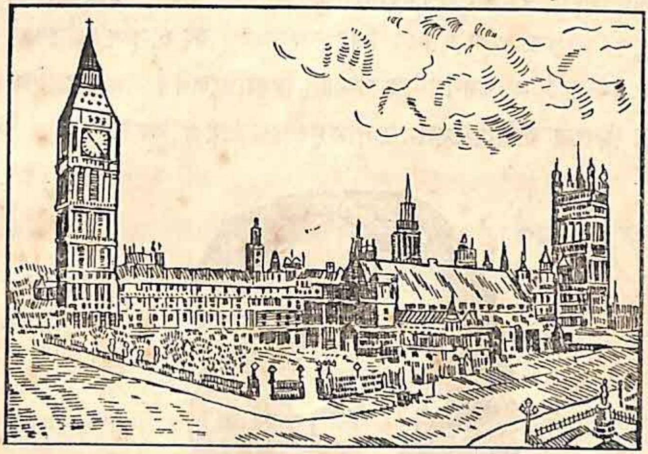
অবশেষে পার্লামেণ্ট ষ্টুয়ার্টবংশের দ্বিতীয় রাজা প্রথম চার্ল্‌সের নিকট তাঁহাদের দাবি জানাইয়া এক দরখাস্ত পেশ করিল। এই দরখাস্তকে বলা হইল 'পিটিশন অব রাইট' বা অধিকার আদায়ের আবেদন। এই আবেদনে জানান হইয়াছিল যে রাজা পার্লামেণ্টের বিনা অনুমতিতে কোন কর আদায় করিতে পারিবেন না এবং বিনা বিচারে কাহাকেও আটক করিতে পারিবেন না। চার্ল্‌স এই দাবিগুলি মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু কিছুদিন না যাইতেই তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া তিনি যথেচ্ছভাবে কর আদায় করিতে লাগিলেন। পার্লামেণ্ট ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলে তিনি পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং দীর্ঘ ১১ বৎসর স্বেচ্ছামত রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।



দ্বিতীয় জেমস্

মাঝে একবার মাত্র তিন সপ্তাহের জন্য তিনি পার্লামেণ্ট ডাকিয়াছিলেন।

১১ বৎসর কুশাসনের পর দারুণ অর্থাভাবে পড়িয়া চার্ল্স আবার পার্লামেণ্ট আহ্বান করিতে বাধ্য হন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে এই পার্লামেণ্ট ডাকা হয়।



ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের বাড়ী

ইহা ১৯ বৎসর স্থায়ী ছিল বলিয়া ইহাকে দীর্ঘ পার্লামেণ্ট বলা হয়। পদে পদে চার্ল্সের সহিত এই পার্লামেণ্টের বিবাদ চলিতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত পার্লামেণ্ট পিমের নেতৃত্বে 'বিরাট প্রতিবাদ' সম্বলিত একখানি দলিল তৈরী করিলেন। এই দলিলে বর্ণিত কয়েকটি বিষয়ে পার্লামেণ্টের কয়েকজন সভ্য আপত্তি উত্থাপন করেন। এই সুযোগে চার্ল্স পিম প্রমুখ পাঁচজন সভ্যকে সশস্ত্র অনুচর লইয়া বন্দী করিতে যান কিন্তু সভ্যগণ পূর্ব্ব হইতেই রাজার চক্রান্ত জানিতে পারিয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন। ইহার পরই গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ৬ বৎসর চলিয়াছিল। এই সময়ে পার্লামেণ্টের দলের

অদ্বিতীয় নেতা হইয়া উঠিলেন অলিভার ক্রমওয়েল। তাঁহারই নেতৃত্বে শেষ পর্য্যন্ত পার্লামেন্টের জয় হয় এবং দেশদ্রোহিতার অভিযোগে প্রথম চার্ল্‌সের বিচার হয়। তিনি দোষী সাব্যস্ত হন। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। শিরঃচ্ছেদের পূর্ব্বে চার্ল্‌স অতিশয় উন্নত মনোভাব এবং আত্মমর্য্যাদার পরিচয় দিয়াছিলেন। মৃত্যুর দিন তিনি তাঁহার সঙ্গীকে বলিয়াছিলেন 'আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। মৃত্যু আমার



অলিভার ক্রমওয়েল

কাছে ভয়াবহ্ নয়। আমি আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।' শেষ মুহূর্ত্তে ধীর পদক্ষেপে হত্যার জন্য নির্দ্দিষ্ট মঞ্চোপরি উঠিয়া নিস্তব্ধ জনতার সম্মুখে তিনি ঘোষণা

করিলেন, 'আমি শত্রুদের ক্ষমা করিলাম। গৃহযুদ্ধের জন্য দায়ী পার্লামেণ্ট, আমি নই।' তাহার পর বধ্যকাষ্ঠের উপর মাথা রাখিয়া ঘাতককে ইঙ্গিত করিলেন। ঘাতকের এক আঘাতে তাঁহার ছিন্ন মস্তক ভূতলে পড়িয়া গেল।

চার্ল্‌সের হত্যার পর নয় বৎসর পূর্ব্বে যে পার্লামেণ্ট ডাকা হইয়াছিল তাহারই অবশিষ্ট কয়েকজন সভ্য ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের বিলোপ করিলেন। ইংলণ্ডে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইল। ক্রমওয়েল ইহার প্রটেক্টর হইয়া রাজ্য শাসনের অধিকার লাভ করিলেন। ক্রমওয়েল ছিলেন এক পল্লীবাসী ভদ্রসন্তান। বই পড়া, ঘোড়ায় চড়া ও পাইপে ধূম্রপান ছিল তাঁহার প্রিয়। প্রথমে তিনি অশ্বারোহী বাহিনীর একজন বিচক্ষণ নায়ক এবং পরে সমগ্র সেনাবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তাঁহার মত দৃঢ়চেতা লোকের পক্ষেও ইংলণ্ডে শাসন পরিচালনা অতিশয় কঠিন হইয়াছিল। কারণ ইংলণ্ডের লোক স্বাধীনতাও চায়, রাজাও চায়। তথাপি তিনি দেশে শান্তি রক্ষা করিতে এবং ইংলণ্ডের বাহিরে তাঁহার গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১০ বৎসর ইংলণ্ডে কোন রাজা ছিল না। এই ১০ বৎসর ক্রমওয়েলই তাঁহার ইচ্ছামত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর মঙ্ক নামে একজন সেনাপতি পূর্ব্বের পার্লামেণ্টকে ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন এক পার্লামেণ্ট গঠন করেন। নূতন পার্লামেণ্ট প্রথম চার্ল্‌সের পুত্র দ্বিতীয় চার্ল্‌সকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। এইরূপে ইংলণ্ডে ষ্টুয়ার্ট বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

পিতার মৃত্যুর পর স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া দ্বিতীয় চার্ল্‌স

নানা দেশ ঘুরিয়া অনেক বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার রাজত্বকালে তিনি পার্লামেণ্টের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় জেম্‌স রাজা হন। ভ্রাতার ন্যায় তাঁহার দক্ষতা ছিল না। সেই জন্য তাঁহার সহিত পার্লামেণ্টের বিবাদ আবার তীব্র ভাবে আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় জেম্‌স ছিলেন ক্যাথলিক এবং দাম্ভিক। ক্যাথলিক প্রীতি তাঁহার নানা কার্য্যে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি ইংলণ্ডে ঐ ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন ভয়ে ইংরাজগণ ভীত হইয়া পড়িল। ইহা ছাড়া তিনি তাঁহার পিতা প্রথম চার্ল্‌সের মত যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন। রাজার অত্যাচার ও ক্যাথলিক ধর্ম্ম পুনঃপ্রবর্ত্তনের ভয় সমস্ত ইংরাজ জাতিকে একতাবদ্ধ করিল। তাহারা তাঁহার জামাতা উইলিয়াম অব অরেঞ্জকে ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইল। উইলিয়াম ছিলেন প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী এবং হল্যাণ্ড রাজ্যের অধিনায়ক। উইলিয়াম আসিয়া ইংলণ্ডের রাজা হইলেন এবং তৃতীয় উইলিয়াম নামে পরিচিত হইলেন। জেম্‌স্ ফ্রান্সে পলায়ন করিলেন। এইরূপে ইংলণ্ডে ষ্টুয়ার্টদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিপ্লবের অবসান ঘটে। এই বিপ্লবের বিশেষত্ব এই যে বিনাযুদ্ধে এবং বিনা রক্তপাতে অবাঞ্ছিত রাজাকে সিংহাসন হইতে তাড়াইয়া দিয়া জনসাধারণের ইচ্ছামত নূতন একজনকে সিংহাসনে বসান হইল। এই জন্য ইহাকে 'গৌরবময় বিপ্লব' বলা হয়।

উইলিয়াম সিংহাসন লাভ করেন পার্লামেণ্টের অনুগ্রহে। সুতরাং তাঁহার রাজত্বকালে পার্লামেণ্টের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ষ্টুয়ার্ট-দের সহিত যে যে বিষয় লইয়া পার্লামেণ্টের বিবাদ ছিল সেই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে একটি আইন পাশ করা হইল।

ইহাকে 'বিল অব্ রাইট্' বলা হয়। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি এমন আইন পাশ করা হইল যাহা দ্বারা রাজার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ এবং পার্লামেণ্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইল। এই সময় হইতে ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

অনুশীলনী

১। টিউডর রাজত্বকালে ইংলণ্ডের অবস্থা সম্বন্ধে কি জান ?

২। ষ্টুয়ার্ট রাজাদের সহিত পার্লামেণ্টের বিবাদের কারণ কি কি ?

৩। 'পিটিশন অব্ রাইট্' কাহাকে বলে ?

৪। কেন এবং কাহার রাজত্বকালে ইংলণ্ডে অন্তর্যুদ্ধ আরম্ভ হয় ?

৫। অন্তর্যুদ্ধে পার্লামেণ্টের পক্ষে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন কে ? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান ?

৬। গৌরবময় বিদ্রোহ কাহাকে বলে ? কি কারণে এবং কাহার সময়ে এই বিদ্রোহ হইয়াছিল ? এই বিদ্রোহের ফল কি হইয়াছিল ?

———

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতে ইংরাজ-অধিকার স্থাপন

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ঔরঙ্গজেবের জীবিতকালেই বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। মারাঠা, রাজপুত ও শিখগণ শক্তিশালী হইয়া ওঠে। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সারা ভারতে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। বাংলা, দাক্ষিণাত্য ও অযোধ্যার শাসন-কর্ত্তাগণ কার্য্যতঃ স্বাধীন হইয়া ওঠেন। তাঁহারা নামে মাত্র দিল্লীর সম্রাটের প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন। সম্রাট ছিলেন মন্ত্রীদের হাতে বাঁধা। তাঁহার প্রকৃত ক্ষমতা দিল্লী এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানগুলির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ইহার উপর পর পর নাদির শাহ্ এবং আহম্মদ শাহের দিল্লী আক্রমণের ফলে মোগল সাম্রাজ্যের কাঠামো একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়। এই সকল রাজ্যের রাজারা ছিলেন অত্যাচারী। তাঁহাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব লাগিয়াই থাকিত। সমগ্র ভারতকে রক্ষা করিতে পারে এমন রাজশক্তির অভাবে ভারতবর্ষ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। এই দুর্ব্বলতা ইউরোপীয় বণিকগণকে এ দেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের সুযোগ ও সুবিধা আনিয়া দিল।

ফরাসী অধিকৃত পণ্ডিচেরীর গবর্ণর ডুপ্লের মনে সর্ব্বপ্রথম ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের কথা উদয় হয়। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে

এদেশের যে অবস্থা তাহাতে দেশীয় রাজাদের অন্তর্দ্বন্দ্বে এক পক্ষে যোগ দিয়া যুদ্ধ করিতে পারিলে সহজে এবং অল্প ব্যয়ে ভারতে ফরাসী রাজশক্তি স্থাপন করা যাইতে পারে।



ডুপ্লে

ডুপ্লের কার্য্যকলাপ দেখিয়া ক্লাইভের মনেও ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা জাগিয়া ওঠে। ক্লাইভ ছিলেন বৃটিশ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী। তিনি ডুপ্লের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। ডুপ্লের চেষ্টা সফল হয় নাই কিন্তু ক্লাইভ অদ্ভুত রকমের সাফল্য লাভ করিয়া ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

অনেকদিন ধরিয়াই ভারতে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে বিবাদ বাধিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। কর্ণাটকের সিংহাসন লইয়া বিবাদের সৃষ্টি হইলে ইংরাজ ও ফরাসীগণ তাহাতে যোগ দেয় এবং উহা লইয়াই দুই জাতির মধ্যে ভারতে যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

দাক্ষিণাত্যে হায়দারাবাদের নিজামের অধীনে আধুনিক মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত কর্ণাটক নামে একটি মুসলমান রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের সিংহাসন লইয়া আনোয়ারুদ্দীন ও চাঁদ সাহেবের মধ্যে বিবাদ

আরম্ভ হয়। কর্ণাটকের নাবালক রাজাকে হত্যা করিয়া আনোয়ারুদ্দীন সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন। চাঁদ সাহেব ছিলেন ঐ রাজ্যের পুরাতন রাজবংশের জামাতা। তিনি আনোয়ারুদ্দীনকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন না। নিজে ঐ সিংহাসন দাবি করিলেন। ঠিক একই সময়ে বৃদ্ধ নিজামের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র নাসিরজঙ্গ ও দৌহিত্র মুজাফ্‌ফরজঙ্গের মধ্যে সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ডুপ্লে এইরূপ সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। তিনি কর্ণাটকে চাঁদ সাহেবের পক্ষ এবং নিজামের দৌহিত্র মুজাফ্‌ফরজঙ্গের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তিনি দেখিলেন ইহাই হইল ভারতে ফরাসী প্রভাব বিস্তারের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুযোগ। উভয় রাজ্যে তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিকে বসাইতে পারিলে দাক্ষিণাত্যে ফরাসী অধিকার স্থাপনে আর কোন বাধা থাকিবে না।

অল্পকাল পরেই নাসিরজঙ্গের মৃত্যু হইলে মুজাফ্‌ফরজঙ্গ নিজামের সিংহাসন লাভ করিলেন ও তথায় ফরাসী প্রতিপত্তি স্থাপিত হইল। কিন্তু এই সময় আনোয়ারুদ্দীনের মৃত্যু হইলেও তাঁহার পুত্র মহম্মদ আলি ও চাঁদ সাহেবের মধ্যে কর্ণাটকের সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ইহাকে দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধে ক্লাইভের বুদ্ধি ও বীরত্বের বলে চাঁদ সাহেব ও ফরাসীদের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী পরাজিত হইল এবং ইংরাজদের মনোনীত মহম্মদ আলীকে কর্ণাটকের সিংহাসনে বসান হইল। কর্ণাটকে ইংরাজ প্রাধান্য স্থাপিত হইল। এইরূপে দাক্ষিণাত্যে নিজামের রাজ্য হায়দারাবাদে ফরাসী প্রতিপত্তি ও কর্ণাটকে ইংরাজ প্রাধান্য স্থাপিত হইল। ইহার পর ডুপ্লেকে ফরাসী সরকার স্বদেশে

ডাকিয়া লইয়া যান। ডুপ্লে চলিয়া যাইবার পর অকর্ম্মণ্য সেনাপতিদের হস্তে ফরাসী সৈন্যবাহিনী পরিচালনার ভার পড়ে।

ক্লাইভ বাল্যকালে অতিশয় দুর্দ্দান্ত ছিলেন। লেখাপড়া না করিয়া কেবল প্রতিবেশীদের উপর নানা প্রকারের অত্যাচার করিয়া বেড়াইতেন। ইহাতে তাঁহার পিতা রাগ করিয়া তাঁহাকে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরানী করিয়া ভারতে পাঠাইয়া দেন। কর্ণাটকের যুদ্ধের সময় তিনি মসী ছাড়িয়া অসি ধারণ করেন এবং ক্রমে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি তিনিই স্থাপন করেন।



ক্লাইভ

বঙ্গদেশে ব্রিটিশ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী কাশিমবাজার ও হুগলীতে কুঠি স্থাপন করিয়াছিল। বাংলার রেশমবস্ত্র রপ্তানী করিয়া উহারা খুব লাভবান হইত। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে জব চার্ণক নামে একজন ইংরাজ ভাগীরথীর তীরে সূতানটি নামক গ্রামে একটি কুঠি স্থাপন করেন। এইরূপে জব চার্ণক বৃটিশ ভারতের ভবিষ্যৎ রাজধানী কলিকাতা নগরীর পত্তন করিলেন। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ আত্মরক্ষার জন্য সূতানটিতে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে সূতানটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী

কিনিয়া লয়। এই তিনটি গ্রাম লইয়া কলিকাতা নগরী স্থাপিত হইল। তখন ইহা গঙ্গার ধারে তিন মাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া ছিল। জব চার্ণকের কলিকাতাতে মৃত্যু হয়।

কলিকাতা নগরী স্থাপনের প্রায় ৬০ বৎসর পরে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে ক্লাইভ নবাবের কয়েকজন কর্ম্মচারীর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এই ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ছিলেন জগৎ শেঠ, মাণিক চাঁদ ও উমিচাঁদ। সিরাজকে সরাইয়া মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য এই ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল। উদ্দেশ্য সাধনের উদ্যোগ আয়োজন শেষ হইলে ক্লাইভ প্রকাশ্যে সিরাজদৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। নবাব সসৈন্যে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিস্তৃত পলাশীর আম্রবাগানে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়। বিশ্বাসঘাতক রায় দুর্লভ ও মীরজাফর বিপুল সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া রহিলেম—যুদ্ধ করিলেন না। নবাবের পক্ষে মোহনলাল ও মীরমদন অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া প্রাণপণ যুদ্ধ করিলেন এবং এই দুই দেশপ্রেমিক সাহসী যোদ্ধা ইংরাজদের অবস্থা সঙ্কটপূর্ণ করিয়া তুলিলেন। অকস্মাৎ গুলির আঘাতে মীরমদন নিহত হইলে মীরজাফরের চক্রান্তে সিরাজ যুদ্ধ বন্ধ করিতে আদেশ দেন।



সিরাজদ্দৌলা

সৈন্যগণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ পলাইতে আরম্ভ করিল। সিরাজও পলাইয়া গেলেন। ইংরাজরা মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসাইলেন। ইহার কয়েকদিন পরেই সিরাজ ধৃত ও নিহত হন। মীরজাফর ইংরাজদের হাতের ক্রীড়নক হইয়া রহিলেন। প্রকৃতপক্ষে ক্লাইভই বাংলাদেশের ভাগ্য-বিধাতা হইলেন। কিছুকালের মধ্যেই মীরজাফর ইংরাজদিগের বিরাগভাজন হইলেন। তাহারা তাঁহাকে সরাইয়া তাঁহার জামাতা মীর কাশিমকে বাংলার মস্‌নদে বসাইলেন।

সুযোগ পাইলে মীর কাশিম শাসকরূপে খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন। তাঁহার শাসন পরিচালনা করিবার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু নবাব হইয়াই বুঝিলেন স্বাধীনভাবে কিছু করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। ইংরাজদের আধিপত্য তাঁহার কাছে অসহ্য হইল। এজন্য তিনি মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। ক্রমে ইংরাজদের সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হইল। বিবাদ যুদ্ধে পরিণত হইল। যুদ্ধে মীরকাশিম দুইবার পরাজিত হইলেন। অবশেষে তৃতীয় বারের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সাহায্য প্রার্থনা করেন। অযোধ্যার নবাব তাঁহার সৈন্য লইয়া বাংলা আক্রমণ করেন। বক্‌সারে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হইল। নবাবসৈন্য পরাজিত হইল। ইহার পর সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে মীরকাশিম ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে চলিয়া যান এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

পূর্ব্বেই ইংরাজগণ বৃদ্ধ মীরজাফরকে পুনরায় বাংলার মসনদে বসাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রকে নবাবের পদে বসাইয়া নবাবের নামে ইংরাজেরাই বাংলার শাসন চালাইতে লাগিল।

এ ব্যবস্থাও বেশী দিন চলিল না। ক্লাইভ দিল্লীর মোগল সম্রাট শাহ্ আলমের তুষ্টি সাধন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিলেন। অর্থাৎ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায় করা এবং রাজস্ব সংক্রান্ত শাসন পরিচালনা করিবার আইনতঃ অধিকার লাভ করিলেন। নামে মাত্র একজন নবাব রহিলেন। ইংরাজেরা বাংলা শাসনের একটা বন্দোবস্ত করিল। দেশরক্ষা ও রাজস্ব সংক্রান্ত সকল বিষয়ের দায়িত্ব তাহারা নিজেদের হাতে রাখিল। দেশ শাসনের ভার থাকিল নবাবের উপর। ইহাকে দ্বৈত শাসন বলা হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহার দোষগুলি প্রকাশ হইয়া উঠিল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন বাংলার শাসন ভার নিজেদের হাতে লইল। কোম্পানীর ডিরেক্টর-গণ ওয়ারেন হেষ্টিংসকে বাংলার গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস গবর্ণর জেনারেল হইলেন। হেষ্টিংস ও তাঁহার পরবর্ত্তী গবর্ণর জেনারেলগণ ক্রমে সমগ্র ভারতে ইংরেজ অধিকার বিস্তার করেন। কেমন করিয়া ভারতে ইংরাজগণ তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিল এই বারে সেই কথাই বলিব।

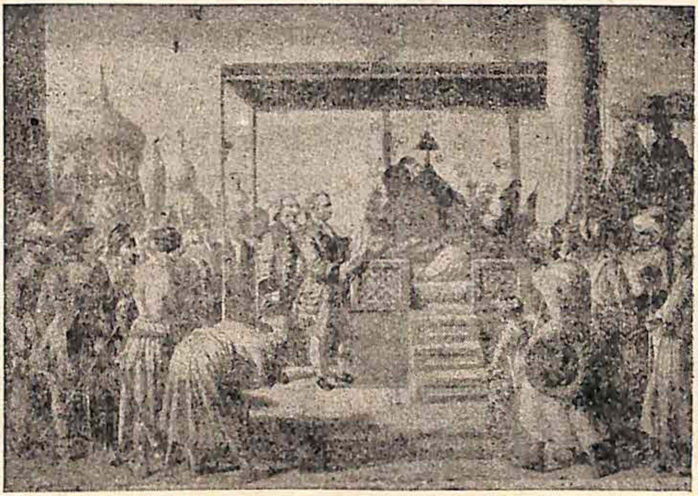


ওয়ারেন হেষ্টিংস্

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে তখন অনেকগুলি রাজ্য ছিল। দাক্ষিণাত্যে মহীশূর, নিজাম ও মারাঠা রাজ্য, উত্তর ভারতে অযোধ্যা, কাশ্মীর ও

পাঞ্জাবে শিখ রাজ্য ও সিন্ধু ইত্যাদি একে একে সকল রাজ্যই ইংরাজরা গ্রাস করিয়া লইল।

মহীশূর—বাংলাদেশে যখন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহাদের প্রভুত্ব স্থাপন করিতেছিল তখন দাক্ষিণাত্যে একটি নূতন রাজ্য শক্তিশালী



সম্রাট শাহ্ আলমের নিকট হইতে ক্লাইভ দেওয়ানী গ্রহণ করিতেছেন

হইয়া উঠিতেছিল। রাজ্যটির নাম মহীশূর। এই রাজ্যের দুর্ব্বল হিন্দু রাজার হাত হইতে সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া যিনি রাজ্যটিকে শক্তিশালী করিয়া তোলেন তাঁহার নাম হায়দর আলি। হায়দর আলি প্রথমে এই রাজ্যের একজন সামান্য সৈনিক ছিলেন। ক্রমে নিজ বুদ্ধি-বলে তিনি সৈন্যাধ্যক্ষের পদ লাভ করিয়া নিজেই ঐ রাজ্যের রাজা হন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত রাজ্য শাসন করেন এবং নিজাম ও মারাঠা

রাজ্যের কতক অংশ জয় করিয়া অতিশয় শক্তিশালী হইয়া ওঠেন। তাঁহার রাজধানী ছিল শ্রীরঙ্গপত্তন। তাঁহার সহিত ইংরাজদের দুইবার যুদ্ধ হয়। প্রথম যুদ্ধে তিনি হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাসিত ভাবে মাদ্রাজের পাঁচ মাইল দূরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাদ্রাজের ইংরাজগণ হায়দর আলির ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়াপড়িলেন। তাহারাঅনন্যোপায় হইয়া হায়দরের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ইংরাজদের সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধেও হায়দর অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। এই যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই আশী বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।



হায়দর আলী

হায়দর আলি তাঁহার অধ্যবসায় ও কর্ম্মদক্ষতার বলে ক্ষুদ্র একটি রাজ্যকে একটি শ্রেষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করিয়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। তিনি নিজের চেষ্টায় সামান্য সৈনিকের পদ হইতে একটি শক্তিশালী রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার মনের দৃঢ়তা, অদম্য সাহস, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও অদ্ভুত স্মরণশক্তি ছিল এবং যুদ্ধে তিনি ছিলেন, ধীর, সাহসী, ও দূরদর্শী। তিনি লেখাপড়া জানিতেন না। কিন্তু শাসনকার্য্যের যাবতীয় কাজ অতি দ্রুততার সহিত নিজেই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার সহিত সাধারণের দেখা-সাক্ষাতে কোন বাধা ছিল না। একসঙ্গে বহু বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার

অসাধারণ ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে ছিলেন উদার। তিনি কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেন না এবং পরাজয়ে নিরাশ হইতেন না।

হায়দরের মৃত্যুর পর টিপু মহীশূরের সুলতান হইলেন এবং ইংরাজদের সহিত কিছুদিন যুদ্ধ চালাইয়া সন্ধি করিলেন। কিন্তু সন্ধি বেশীদিন স্থায়ী হইল না। ইংরাজগণ দেশীয় রাজ্যগুলি তাহাদের অধীনে আনিবার জন্য এক নূতন নীতি অবলম্বন করিল। তাহারা এই নীতির বলে টিপুকে তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিতে বলিল। টিপু অস্বীকার করিলে তখনকার গবর্ণর-জেনারেল ওয়েলেস্‌লি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। টিপু শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গদ্বারে অসি হস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন (১৭৯৯) কিন্তু অধীনতা স্বীকার করিলেন না। ইংরাজরা মহীশূর রাজ্য অধিকার করিয়া লইল। টিপুর পরিবারের লোকদিগকে কলিকাতায় নির্ব্বাসিত করা হইল। কলিকাতা ধর্ম্মতলার মোড়ে যে বৃহৎ মস্‌জিদটি আছে উহা টিপুর পুত্র গোলাম মহম্মদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। রাজভবনের সিংহাসনকক্ষে যে সিংহাসনটি আছে সেখানি টিপু সুলতানের সিংহাসন ছিল।



টিপু সুলতান

টিপু সুলতান বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার চরিত্র ছিল নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র। তাঁহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল না।

তিনি পরিশ্রমী, সাহসী ও ন্যায়-নিষ্ঠ শাসক ছিলেন। মুসলমান ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাহা হইলেও অন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি একেবারে অনুদার ছিলেন না। মাঝে মাঝে তাঁহার নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাইলেও তিনি স্বভাবতঃ নির্দ্দয় ছিলেন না। তিনি ফ্রান্স ও তুরস্কে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইংরাজ লেখকগণও মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। অধীনতা স্বীকার করার চেয়ে জীবন বিসর্জ্জনই তিনি শ্রেয় মনে করিয়াছিলেন।

টিপুর মৃত্যুর দুই বৎসর পরে কর্ণাটকের নবাবকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সরাইয়া দিয়া গবর্ণর-জেনারেল ওয়েলেস্লি ঐ রাজ্যটি বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন।

মারাঠা—ঔরঙ্গজেব শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীকে বন্দী করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার আদেশে শম্ভুজীকে হত্যা করা হয়। তিনি শম্ভুজীর পুত্র শাহুকেও বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শাহু মুক্তি পাইয়া দেশে আসিয়া রাজা হন। তিনি অতিশয় বিলাসী ছিলেন, রাজকার্য্য কিছুই দেখিতেন না। এক জন ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর উপর সব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই মন্ত্রীকে বলা হইত পেশোয়া। প্রথম পেশোয়া ছিলেন বালাজী বিশ্বনাথ। শাহুর পরে এই পেশোয়ারাই মারাঠা রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। পেশোয়াগণ পুণা নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।

পেশোয়াদের অধীনে মারাঠা সাম্রাজ্য আয়তনে অনেক বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁহাদের সৈন্যের বহর ও রাজ্যবৃদ্ধির লিপ্সা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে অবিলম্বে সমগ্র-ভারতের অধীশ্বর হইবার সম্ভাবনা তাঁহাদের প্রায় সুনিশ্চিত হইয়া উঠিল। কিন্তু মারাঠাদের সে সৌভাগ্য

ছিল না। মারাঠারা উত্তর ভারতে পাঞ্জাব জয় করিয়া লইলে আহম্মদ শাহ দুরাণী বহু সৈন্য লইয়া আসিয়া পাঞ্জাব অধিকার করিয়া লন। কিছুকাল পরেই মারাঠারা পাঞ্জাব আবার অধিকার করিয়া লয়। মারাঠারা পাঞ্জাব অধিকার করিয়াছে শুনিয়া আহম্মদ শাহ আবদালী বহু সৈন্য লইয়া আসিয়া পঞ্চমবার ভারত আক্রমণ করেন। তিনি সহজেই পাঞ্জাব পুনরধিকার করেন। পাণিপথের নিকট আহম্মদ শাহের সহিত মারাঠাদের ভীষণ যুদ্ধ হইল। মারাঠাগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও জয়ী হইতে পারিল না। ইহাই পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।

পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের শক্তি কমিয়া গেলেও তাহারা আবার শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতে লাগিল এবং অসাধারণ প্রতিভাশালী পেশোয়া মাধব রাও নিজাম ও হায়দর আলিকে পরাজিত করিয়া আবার উত্তর ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করিতে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে (১৭৭২ খৃঃ) মারাঠাদের সে আশা চিরতরে লুপ্ত হইল এবং ইংরাজদের ভারতে আধিপত্য স্থাপনের পথ সুগম করিয়া দিল।

মাধব রাওর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়ার পদ লাভ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁহার খুল্লতাত রাঘব রাওর চক্রান্তে তিনি নিহত হন। রাঘব রাও নিজেকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করেন। কিছু দিন পরে মাধব রাওর পত্নীর গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মিলে রাজ্যের একদল প্রতিপত্তিশালী লোক এই শিশুকে পেশোয়ার পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং নানা ফর্ণবিশের নেতৃত্বে মারাঠা প্রধানগণ রাঘব রাওর বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। এই শিশুর নাম মাধব রাও নারায়ণ। রাঘব রাও ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হন। ইংরাজগণ রাজ্যলোভে রাঘব রাওএর পক্ষ

লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এই যুদ্ধ বহুদিন ধরিয়া ও বহু পর্য্যায়ের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে উভয়পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইলে যুদ্ধের অবসান হয়। এই সন্ধি সলবাইয়ের সন্ধি নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে নানা ফর্ণবিশ মারাঠাদের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তিনিই ইংরাজদের বিরুদ্ধে মারাঠাগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বড় রকমের রাজনীতিজ্ঞ। তাঁহার তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি, নূতন নূতন কৌশল উদ্ভাবনের শক্তি সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে মারাঠাদের ঠিক পথে পরিচালিত করিবার আর কেহ থাকিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর ইংরাজদিগের সহিত মারাঠাদের আরও দুইটি যুদ্ধ হয়। উহা দ্বিতীয় (১৮০৩—৫) ও তৃতীয় (১৮১৭—১৮) মারাঠা যুদ্ধ নামে পরিচিত। তৃতীয় যুদ্ধের পর (১৮১৮ খৃঃ) পেশোয়া পদ লুপ্ত হইল। তাঁহার সাম্রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লওয়া হইল। মোগল সম্রাটের উপর যাহারা আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল সেই মারাঠা জাতির গৌরবরবি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল।



নানা ফর্ণবিশ

ভারতে প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য ইংরাজগণ যখন ভারতের রাজ্যগুলির সহিত এই রূপে যুদ্ধ করিতেছিল সেই সময় গবর্ণর-

জেনারেল ওয়েলেস্‌লি, দেশীয় রাজ্যগুলি যাহাতে কোন বিদেশী শক্তির সাহায্য লাভ করিয়া প্রবল হইতে না পারে, তাহার জন্য এক নূতন নীতির প্রবর্ত্তন করেন। এই নীতিকে বশ্যতামূলক মৈত্রী বা 'সাব্‌সিডিয়ারি অ্যালায়েন্স' বলা হয়। এই নীতি প্রবর্ত্তনের দ্বারা প্রত্যেক দেশীয় রাজাকে ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করিতে, কোন বিদেশী শক্তির সহিত সন্ধি-বিগ্রহ না করিতে, রাজ্যের মধ্যে একজন বৃটিশ রেসিডেণ্ট বা সরকারী কর্ম্মচারী ও একদল বৃটিশ সৈন্য রাখিতে এবং উহাদের সর্ব্ববিধ ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যেক রাজাকে তাঁহার রাজ্যের এক অংশ ছাড়িয়া দিতে বলা হইল। যাঁহারা এই সর্ত্তে বশ্যতা স্বীকার করিবেন ইংরাজেরা তাঁহাদের রক্ষা করিবেন। মোট কথা, রক্ষা করিবার নামে ইংরাজদের দেশীয় রাজ্যগুলির উপর পূর্ণ আধিপত্য স্থাপনের ইহা একটি চমৎকার ব্যবস্থা। হায়দরাবাদের নিজাম ও অযোধ্যার নবাব এই সকল সর্ত্ত মানিয়া লইলেন এবং চিরদিনের জন্য স্বাধীনতা হারাইলেন। পরে কুশাসনের অপরাধে অযোধ্যার নবাবকে সরাইয়া দিয়া তাঁহার রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লওয়া হইল (১৮৫৬ খৃঃ)। নবাবকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় আনিয়া রাখা হইল।

শিখ—মোগল সম্রাটদের রাজত্বকালে শিখেরা একটি শক্তিশালী সামরিক জাতিতে পরিণত হয় এ-কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যিনি শিখরাজ্য স্থাপন করেন তাঁহার নাম রণজিৎ সিংহ। তিনি ইউরোপীয় সেনাপতিদের দ্বারা শিখ সৈন্যদের যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন এবং দুর্দ্ধর্ষ খালসা সৈন্যদল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। খালসা সৈন্যগণ রণ-কৌশলে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ইহাদের সাহায্যে রণজিৎ সিংহ সমগ্র পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও কাবুল জয় করিয়াছিলেন।

শিবাজী ও হায়দর আলির মত রণজিৎও লেখাপড়া জানিতেন না। তিনি দেখিতে কুৎসিৎ ছিলেন। বসন্ত রোগে তাঁহার একটি চোখ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। রণজিৎ একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। একজন ফরাসী পর্য্যটকের মতে তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ মানব। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। তিনি কখনও অন্যায়ভাবে নিষ্ঠুর কার্য্যদ্বারা তাহার হস্ত রঞ্জিত করেন নাই। একজন খৃস্টান পর্য্যটক বলিয়াছিলেন যে—এত অল্প রক্ত-পাতে এতবড় সাম্রাজ্য কেহ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। তাঁহার রাজ উত্তরে কাশ্মীর ও পার্ব্বত্য প্রদেশ এবং পশ্চিমে পেশোয়ার হইতে বৃটিশ রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করেন নাই। তাহাদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবকেশরী রণজিতের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর শিখগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং খালসা সৈন্যগণ সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া ওঠে। ইহাতে অমাত্যগণ উহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সমর অভিলাষী সৈন্যগণকে বৃটিশ রাজ্য আক্রমণ করিতে উৎসাহিত করেন। ইংরাজদিগের কার্য্যকলাপে শিখ সৈন্যরা সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। অমাত্যদের নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়া তাহারা ইংরাজ রাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। এইরূপে


রণজিৎ সিংহ

শিখদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শিখ ও ইংরাজদের মধ্যে দুইটি যুদ্ধ হয়। শেষ যুদ্ধে শিখেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। তখনকার গবর্ণর-জেনারেল ছিলেন ডালহৌসী। তিনি পাঞ্জাব ও কাশ্মীর ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লন।

ইহার পর ইংরাজগণ সিন্ধু ও ব্রহ্মদেশ জয় করে।

এইরূপে বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমগ্র ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। ইহার কতক অংশের উপর সরাসরি শাসন স্থাপিত হইল আর কতক অংশে আশ্রিত ও অনুগৃহীত রাজাদের হাতে শাসনভার অর্পিত হইল। কিন্তু এই সকল রাজাদের কোন স্বাধীনতাই থাকিল না।

সিপাহী বিদ্রোহ—সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে ভারতে বৃটিশ শাসন দৃঢ় ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু অনেকগুলি কারণে দেশের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। ডালহৌসী স্বত্বলোপ নীতি গ্রহণ করিয়া উত্তরাধিকারীর অভাবে অনেক আশ্রিত ও অনুগত রাজাদের রাজ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া নানা কারণ দেখাইয়া তিনি আরও অনেক দেশীয় রাজ্যের বিলোপ সাধন করিয়া ছিলেন। ইহাতে ঐ সকল রাজাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। এই নীতির জন্য যাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা ইংরাজ তাড়াইবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নানা সাহেব ও ঝান্সীর রাণীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অযোধ্যার লোক, তাহাদের নবাবকে অন্যায়ভাবে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে মনে করিয়া চটিয়া গিয়াছিল। সিপাহীদের মধ্যে অযোধ্যার লোক অনেক ছিল।

এই সময়ে আবার দেশে ইংরাজী-সভ্যতার প্রচলন হইতেছিল। উহার সহিত ইসলাম বা হিন্দু শাস্ত্রের সহিত কোন সঙ্গতি ছিল না।

দেশে ইংরাজী ভাষার প্রবর্ত্তন করা হইল, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ স্থাপিত হইল, খৃস্টান পাদ্রীরা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল কারণে সাধারণ লোক মনে করিতে লাগিল যে দেশের লোকের ধর্ম্ম নষ্ট করাই ইংরাজদের উদ্দেশ্য।

সিপাহীরা অসন্তুষ্ট হইয়াছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশি। যুদ্ধের জন্য তাহাদের ভারতের বাহিরে অপরিচিত দেশে পাঠান হইতেছিল। তাহাতে তাহাদের জাতি যাইবার ভয় ছিল। তাহারা বেশি ভাতা দাবি করিল কিন্তু পাইল না। এইরূপ অবস্থায় যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য সিপাহীদের একপ্রকার নূতন ধরণের বন্দুক দেওয়া হইল। এই বন্দুকে টোটা ব্যবহার করিতে হইত। টোটা দাঁত দিয়া কাটিয়া বন্দুকে পুরিতে হইত। সিপাহীদের বিশ্বাস হইল যে ঐ সকল টোটায় শূকরের ও গরুর চর্ব্বি মাখান আছে। উহা দাঁত দিয়া কাটিলে হিন্দু-মুসলমান সকলেরই জাতি নষ্ট হইবে। ইহাতে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ব্যারাকপুরে বিদ্রোহের সূত্রপাত হইয়া মীরাটে ভীষণ আকার ধারণ করিল। এই সময়ে ভারতে গোরা সৈন্যের সংখ্যা খুব কম ছিল।

মীরাটে বিদ্রোহীরা রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়া বহু ইংরাজকে হত্যা করে। সেখান হইতে তাহারা দিল্লী গমন করে এবং দিল্লী অধিকার করিয়া বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে সিংহাসনে বসাইয়া আবার স্বাধীন মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। দেখিতে দেখিতে বাংলা দেশ হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িল। সিপাহীরা ইংরাজদের হত্যা করিতে লাগিল। দিল্লী, লক্ষ্নৌ ও কানপুর তাহাদের প্রধান ঘাঁটি ছিল

এই বিদ্রোহীদের দলপতি ছিলেন তিনজন—নানা সাহেব, তাঁতিয়া তোপি এবং ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ। নানা সাহেব ছিলেন পেশোয়ার পোষ্যপুত্র। ডালহৌসী তাঁহার বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁতিয়া তোপি নানাসাহেবের সেনাপতি ছিলেন। ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মী বাঈকে ডালহৌসী দত্তক গ্রহণ করিতে দেন নাই।

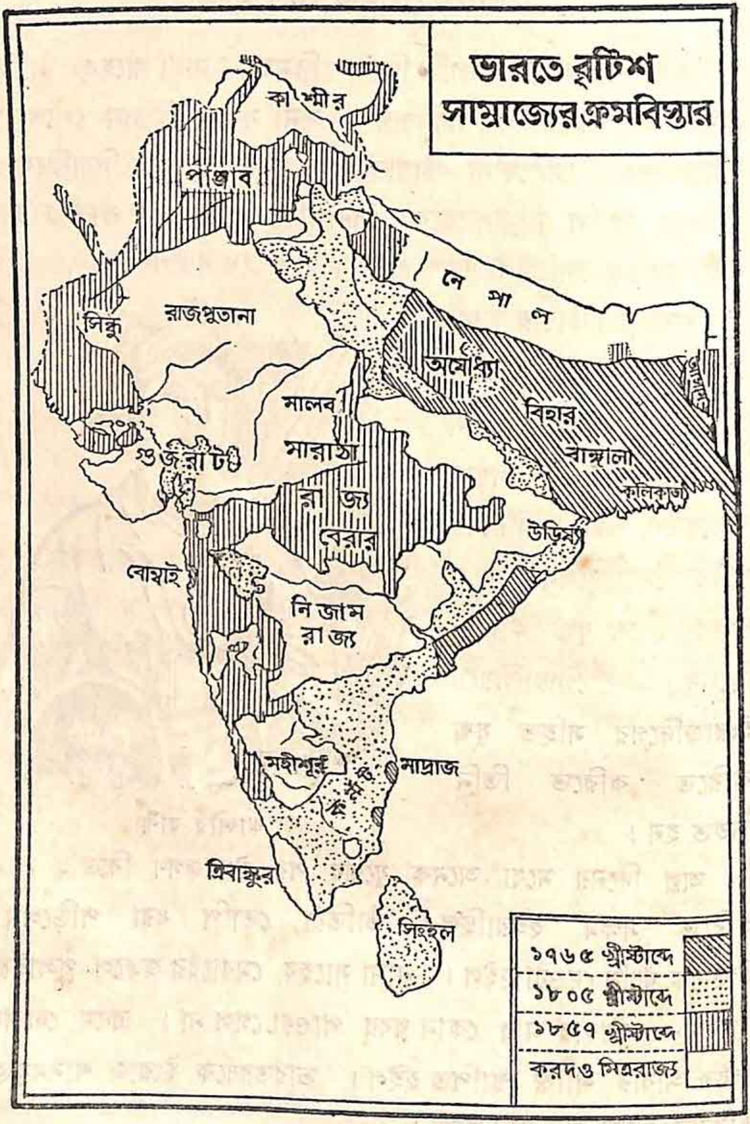
লক্ষ্মী বাঈ তাঁহার ঝান্সী রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। নিজে পুরুষ বেশে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়রে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি নিহত হন।



ঝান্সীর রাণী

অল্প দিনের মধ্যে অনেক যুদ্ধের পর ইংরাজগণ বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাঁতিয়া তোপি ধরা পড়িলেন। তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া হইল। নানা সাহেব মেবারের জঙ্গলে পলাইয়া গেলেন। তাঁহার আর কোন খবর পাওয়া গেল না। ক্রমে দেশের সর্ব্বত্র আবার শান্তি স্থাপিত হইল। ভারতবর্ষকে ইংরাজ শাসনমুক্ত করিবার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

ইহার পর ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট একটি বণিক-কোম্পানীর উপর এত


ভারতে ব্রিটিশ
সাম্রাজ্যের ক্রমবিস্তার
কাশ্মীর
পাঞ্জাব
নেপাল
সিন্ধু
রাজপুতানা
অযোধ্যা
মালব
বিহার
গুজরাট
মারাঠা
রাজ্য
বাঙ্গালা
কলিকাতা
বেরার
উড়িষ্যা
বোম্বাই
নিজাম
রাজ্য
মহীশূর
মাদ্রাজ
ত্রিবাঙ্কুর
সিংহল
১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে
১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে
১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে
করদও মিত্ররাজ্য

বড় দেশের শাসনভার রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারত শাসনের ভার গ্রহণ করিলেন। কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হইল।

অনুশীলনী

১। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের অবস্থা বর্ণনা কর।

২। ভারতে বিদেশী সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম কল্পনা কে করিয়াছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান?

৩। কর্ণাটকের যুদ্ধ সম্বন্ধে কি জান? এই যুদ্ধে ইংরাজদের নেতা কে ছিলেন? তাঁহার বিষয় কি জান?

৪। জব চার্ণক কে ছিলেন? তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি কি?

৫। পলাশী যুদ্ধের বিষয় কি জান? এই যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ঘটিয়াছিল কেন?

৬। সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে যাঁহারা ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম কর।

৭। হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের সম্বন্ধে কি জান?

৮। ইংরাজদের সহিত কি কারণে মারাঠাদের যুদ্ধ হয়? মোট কয়টি যুদ্ধ হইয়াছিল? সে যুদ্ধের ফল কি হইয়াছিল?

৯। বশ্যতামূলক মৈত্রীর নীতি দ্বারা কি বুঝায়? এই নীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন কে?

১০। রণজিৎ সিংহ কে ছিলেন? তাঁহার বিষয় কি জান?

১১। ইংরাজদের সহিত শিখদের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

১২। সিপাহী বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

১৩। সিপাহী বিদ্রোহের নেতাদের নাম কর। তাঁহাদের বিষয় কি জান?

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমেরিকার বিদ্রোহ এবং যুক্তরাষ্ট্র গঠন

সপ্তদশ শতব্দীতে বহু ইংরাজ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মহাসাগর পার হইয়া উত্তর আমেরিকায় গিয়াছিল। তথায় যাইয়া তাহারা ঐ দেশের অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের (লাল মানুষ) তাড়াইয়া দিয়া, অরণ্য কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল এবং এক সভ্য সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছিল। মোট ১৩টি বসতি বা উপনিবেশ লইয়া এই নূতন সমাজ গঠিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে উপনিবেশগুলি তাহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রায় পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিত। এই স্বাধীনতা তাহারা পাইয়াছিল ইংলণ্ডের রাজার নিকট হইতে। কিন্তু বাণিজ্য ব্যাপারে তাহাদের স্বাধীনতা ছিল না। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট বাণিজ্যের উপর অনেক বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়াছিল। যদিও এই সকল বাধা-নিষেধ কোন দিনও কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা হইত না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঐগুলি উপেক্ষা করাই হইত।

একটি বিষয়ে ইংরাজ ঔপনিবেশিকদের ইংলণ্ডের উপর নির্ভর করিতে হইত। উত্তর আমেরিকার কানাডা তখন ছিল ফরাসীদের উপনিবেশ। সেখানকার ফরাসীরা এবং সময় সময় রেড় ইণ্ডিয়ানরা ইংরাজ উপনিবেশ-গুলি আক্রমণ করিত। তাহাদের আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা

করিবার শক্তি ইংরাজ ঔপনিবেশিকদের ছিল না। এ জন্য তাহাদের নির্ভর করিতে হইত ইংলণ্ডের সাহায্যের উপর। তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে সৈন্য পাঠান হইত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সাত বৎসর ধরিয়া যে যুদ্ধ হয় তাহার ফলে ইংলণ্ডের অর্থবল কমিয়া গিয়াছিল। অর্থের ঘাটতি পড়ায় ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট ভাবিতে লাগিলেন যে ইংরাজ ঔপনিবেশিকদের রক্ষা করিবার জন্য যখন আমেরিকায় সৈন্য মোতায়েন করিয়া রাখিতে হয় তখন উহার আংশিক ব্যয়ভার ঔপনিবেশিকদেরই বহন করা উচিত। সুতরাং ঔপনিবেশিকেরা এই জন্য কেন আরও বেশি কর দিবে না?

এদিকে সাতবৎসরের যুদ্ধের ফলে কানাডা ইংরাজদের হস্তগত হয় এবং কানাডা হইতে ফরাসীদের আক্রমণের ভয় দূর হয়। ইহার ফলে আমেরিকার ইংরাজগণ আত্মরক্ষার জন্য মাতৃভূমির উপর আর নির্ভর করার প্রয়োজন বোধ করিল না। কিন্তু ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট স্থির করিল আমেরিকায় এক দল সৈন্য রাখিতে হইবে এবং তাহার জন্য তথাকার ইংরাজদের অতিরিক্ত করও দিতে হইবে। সুতরাং পার্লামেণ্ট তাহাদের উপর নূতন কর ধার্য্য করার সিদ্ধান্ত করিল। তখন উপনিবেশের ইংরাজরা ইহার প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিল ও মাতৃভূমির শাসন হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী গ্রেণভিল 'ষ্ট্যাম্প অ্যাক্ট' নামে এক আইন পাশ করেন। ইহা দ্বারা স্থির হইল যে উপনিবেশের লোকেরা তাহাদের সমস্ত দলিলপত্রে ষ্ট্যাম্প বা আটাল ব্যবহার করিবে। ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হইতে যে অর্থ পাওয়া যাইবে তাহাদ্বারা উপনিবেশ রক্ষাকারী স্থায়ী সৈন্য রাখিবার ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইবে।

ঔপনিবেশিকেরা এই ষ্ট্যাম্প অ্যাক্টের বিরুদ্ধে দারুণ আন্দোলন আরম্ভ করিল এবং কেহই ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিল না। তাহারা দাবি তুলিল যে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে তাহাদের কোন প্রতিনিধি নাই; সুতরাং তাহাদের উপর কর বসাইবার ক্ষমতাও পার্লামেণ্টের নাই। ইহা লইয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার উপনিবেশগুলির মধ্যে যে কলহ আরম্ভ হয় তাহা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধে পরিণত হয়। আন্দোলনের ফলে ষ্ট্যাম্প অ্যাক্ট তুলিয়া দেওয়া হইল কিন্তু পার্লামেণ্ট উপনিবেশগুলির উপর কর বসাইবার অধিকার ছাড়িল না। বহু জিনিসের উপর নূতন কর বসান হইল। ঔপনিবেশিকেরা ঐ সকল দ্রব্য 'বয়কট' করিল বা ব্যবহার করা বন্ধ করিয়া দিল।

চায়ের উপর নূতন শুল্ক বসান হইয়াছিল। উপনিবেশগুলির অসন্তোষ প্রশমিত করিবার জন্য এবং ভারতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সুবিধা দিবার জন্য ভারতীয় চা সরাসরি আমেরিকায় লইয়া যাইয়া সস্তায় বিক্রয় করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। বোষ্টন বন্দরে ভারত হইতে একটি জাহাজ ভর্ত্তি চা আসিলে ঐ বন্দরের লোকেরা জাহাজে উঠিয়া চা-এর বাক্সগুলি জলে ফেলিয়া দিল। এই ঘটনার জন্য বোষ্টন বন্দর ও ম্যাসাচুসেটস্ উপনিবেশটির উপর কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া একটি উপনিবেশ ছাড়া অপর উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিরা ফিলাডেলফিয়াতে জাতীয় মহাসভা বা কংগ্রেসে মিলিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ইংলণ্ড হইতে বোষ্টন বন্দরে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য সৈন্য পাঠান হইল। উহাদের সহিত অধিবাসীদের প্রথম সংঘর্ষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই সব কয়টি উপনিবেশের

প্রতিনিধিগণ দ্বিতীয়বার কংগ্রেসে মিলিত হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। এই দিনটি আজিও আমেরিকায় জাতীয় দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

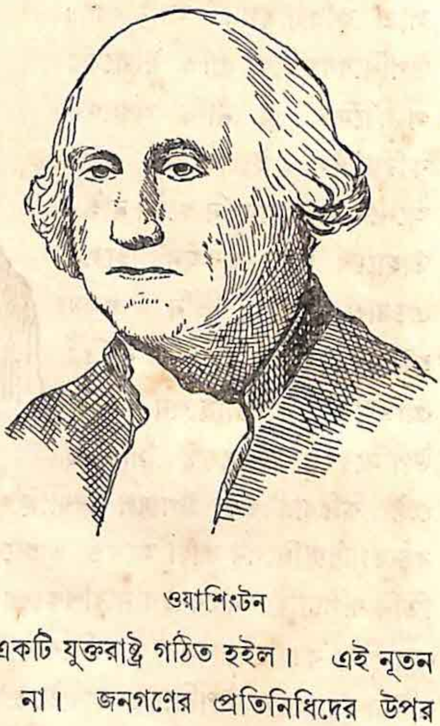
সাত বৎসর ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। এই যুদ্ধে আমেরিকানরা ফরাসীদের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছিল। আমেরিকার উপনিবেশগুলির প্রতি ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিল ইংরাজদের মধ্যে অনেকে তাহা সমর্থন করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন এডমাণ্ড বার্ক। তিনি প্রথম হইতেই পার্লামেণ্টের নীতির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং উপনিবেশগুলির সন্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা আজও তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন যে ঔপনিবেশিকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের উপর কর ধার্য্য করা হইবে অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ। কর আদায় করিতে যাইয়া এতগুলি উপনিবেশ হারাইতে হইলে সে করের কোন মূল্যই থাকিবে না।



এডমাণ্ড বার্ক

আমেরিকানদের প্রধান নেতা ছিলেন জর্জ্জ ওয়াশিংটন। তিনি একজন প্ল্যাণ্টার বা ক্ষেত্রস্বামী ছিলেন। সপ্তবর্ষের যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ

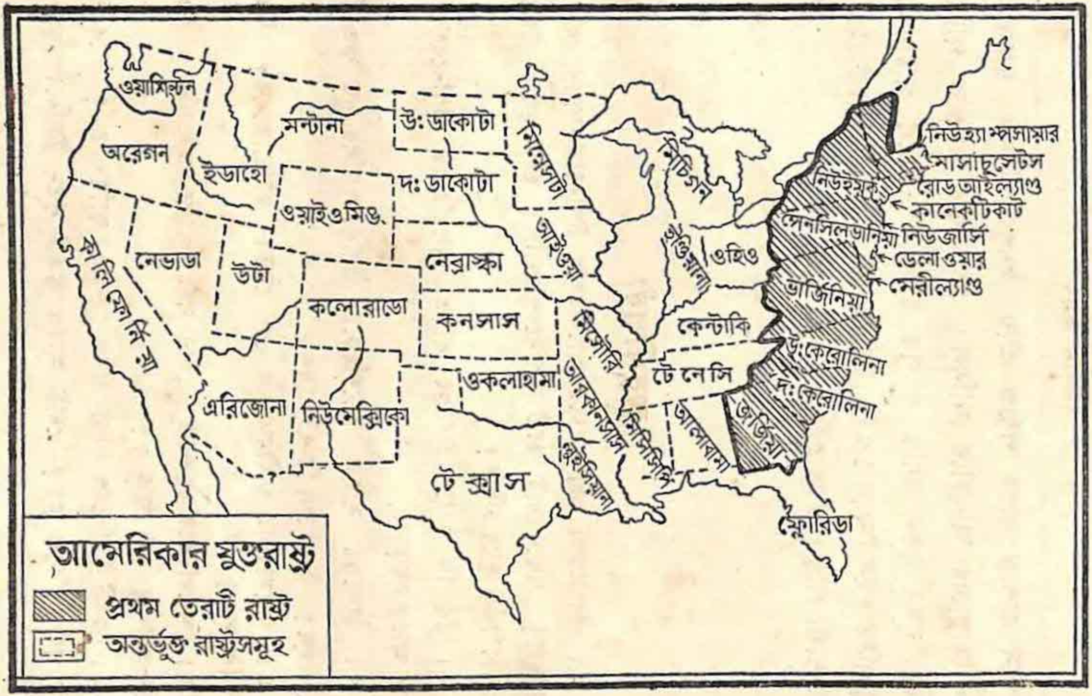
করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে খ্যাতিও লাভ করিয়াছিলেন। ফিলাডেলফিয়ার কংগ্রেস যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পর উপনিবেশগুলি হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা হইল এবং জর্জ্জ ওয়াশিংটনকে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইল। তাঁহারই নেতৃত্বে যুদ্ধে উপনিবেশগুলির জয় হইয়াছিল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস পরিচালিত সমগ্র ব্রিটিশ বাহিনী ওয়াশিংটনের নিকট আত্মসমর্পণ করে। লর্ড কর্ণওয়ালিস পরে ভারতের গবর্ণর-জেনারেল হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পর আমেরিকায় ইংরাজদিগের যুদ্ধ চালান অসম্ভব হইল। ইহার দুই বৎসর পর ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে ভার্সাইর সন্ধিতে তাহারা আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল।



ওয়াশিংটন

ইহার কয়েক বৎসর পর ১৩টি উপনিবেশ মিলিত হইয়া একটি শাসনতন্ত্র রচনা করিল। উপনিবেশগুলি একত্র করিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইল। এই নূতন রাষ্ট্রে কোন রাজা থাকিলেন না। জনগণের প্রতিনিধিদের উপর শাসনভার ন্যস্ত হইল এবং রাজ্যের প্রধানকে বলা হইল প্রেসিডেণ্ট। জর্জ্জ ওয়াশিংটন প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন।

এই রাষ্ট্র ক্রমে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। উপনিবেশগুলির


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র
প্রথম তেরটি রাষ্ট্র
অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ
ওয়াশিংটন
অরেগন
ইডাহো
মন্টানা
উঃ ডাকোটা
দঃ ডাকোটা
ওয়াইওমিঙ
নেভাডা
উটা
কালিফোর্নিয়া
কলোরাডো
নেব্রাস্কা
কনসাস
আইওয়া
মিনেসটা
মিচিগন
ইণ্ডিয়ানা
ওহিও
মিসৌরি
কেন্টাকি
টেনেসি
ওকলাহামা
আরকানসাস
মিসিসিপি
আলাবামা
লুইসিয়ানা
টেক্সাস
এরিজোনা
নিউমেক্সিকো
জর্জিয়া
ফ্লোরিডা
দঃ কেরোলিনা
উঃ কেরোলিনা
ভার্জিনিয়া
পেনসিলভানিয়া
নিউইয়র্ক
নিউহ্যাম্পসায়ার
মাসাচুসেটস
রোড আইল্যাণ্ড
কানেকটিকাট
নিউজার্সি
ডেলাওয়ার
মেরীল্যাণ্ড

পশ্চিমে প্রশান্ত সাগর পর্য্যন্ত প্রায় জনশূন্য বিস্তৃত জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি তাহাদের অধিকারে আসিল। ঐ বিস্তৃত ভূখণ্ডকে পরিষ্কার করিয়া নূতন নূতন বসতি স্থাপিত হইল। এইরূপে আরও ৩৫টি রাষ্ট্র গঠিত হইল। ফলে ১৩টি রাষ্ট্র লইয়া গঠিত যুক্তরাষ্ট্র একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

অনুশীলনী

১। ইংরাজেরা কোন্ সময়ে আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়াছিল? প্রথমে মোট কয়টি উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল? উহাদের শাসনকার্য্য কি ভাবে চলিত?

২। কি কি কারণে ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার উপনিবেশগুলির বিবাদ আরম্ভ হয়?

৩। ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার উপনিবেশগুলির যুদ্ধ কত দিন চলিয়াছিল? উহার ফল কি হইয়াছিল?

৪। আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধে কে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন? তাঁহার বিষয় কি জান?

৫। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কোন্ সময় গঠিত হইয়াছিল? উহার শাসন-প্রণালীর বিষয় কি জান?

৬। কয়টি উপনিবেশ লইয়া প্রথম যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হয়? পরে ইহা কোন্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়? মোট আরও কতটি নূতন উপনিবেশ স্থাপিত হয়?

সপ্তম অধ্যায়

ফরাসী বিপ্লব

ফরাসী বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ইউরোপে নবজাগরণের ফলে দুইটি বিপ্লব হয়। একটি ধর্ম্ম বিপ্লব, তাহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আর একটি রাষ্ট্র বিপ্লব। এই রাষ্ট্র বিপ্লবের স্থান হইল ফরাসী দেশ এবং কাল হইল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা না জানিলে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস বুঝা যায় না। সুতরাং ঐ সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলিব।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্রেণীবৈষম্য, রাজার যথেচ্ছাচার এবং আর্থিক সঙ্কট মিলিয়া ফ্রান্সের অবস্থা দারুণ শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। রাজা ছিলেন স্বৈরাচারী। তাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতেন। রাজস্বের উপর তাঁহার ছিল পূর্ণ অধিকার। রাজা ইচ্ছা করিলে যে কোন লোককে যতদিন ইচ্ছা বন্দী করিয়া রাখিতে পারিতেন। তাঁহার প্রাসাদের জাঁকজমক ও বিলাসিতার জন্য তিনি অকাতরে জনসাধারণের অর্থ ব্যয় করিতেন। এক রাণীরই ছিল ৫০০ দাসী। তিনি সপ্তাহে ৪ জোড়া জুতা ব্যবহার করিতেন। একবার মোমবাতি জ্বালিয়া সেটা আর দ্বিতীয়বার জ্বালান হইত না। এইরূপ মোমবাতি বিক্রয় করিয়া দাসীরা লক্ষ লক্ষ টাকা পাইত। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে যে বিলাসিতার নামে কত টাকাই প্রাসাদে অপব্যয় করা হইত।

ফরাসী দেশের অধিবাসীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে প্রথম তুই শ্রেণী ছিল উচ্চস্তরের ও অপরটি ছিল নিম্নস্তরের। প্রথম তুই শ্রেণী তৃতীয় শ্রেণী হইতে সকল রকমে পৃথক ছিল। প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন উচ্চতর ধর্ম্মযাজকগণ। তাঁহারা ছিলেন প্রচুর



প্রথম শ্রেণীর (ধর্ম্মযাজকের) পোষাক দ্বিতীয় শ্রেণীর (সামন্তদের) পোষাক তৃতীয় শ্রেণীর (সাধারণ লোকের) পোষাক

ভূসম্পত্তির অধিকারী। আমাদের দেশের মোহন্তদের দেবোত্তর সম্পত্তির মত। ঐ ভূসম্পত্তির জন্য তাঁহাদের কোন কর দিতে হইত না। বড় বড় জমিদারদের কনিষ্ঠ ছেলেরাই এই সকল ধর্ম্মযাজকের পদ লাভ করিতেন। ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতেন। তাঁহারা রাজার হালে বাস করিতেন এবং বিলাসিতায় ডুবিয়া

থাকিতেন। অনেকে রাজপ্রাসাদে থাকিতেন এবং আমোদ প্রমোদে দিন যাপন করিতেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন সামন্তগণ বা বড় বড় জমিদারগণ। তাঁহাদিগকেও সম্পত্তির উপর কর দিতে হইত না। আমাদের দেশের জমিদারগণ যেমন নজরানা প্রণামী প্রভৃতি নানাপ্রকারে প্রজাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতেন ফরাসী দেশের সামন্তগণও তেমনি 'ফিউডাল ডিউ' নাম দিয়া কৃষকদের নিকট হইতে নানাপ্রকারে অর্থ আদায় করিতেন। ইহা ছাড়া কৃষকের শস্যে ভরা ক্ষেতের উপর দিয়া তাঁহারা সদলবলে ঘোড়ায় চড়িয়া শিকারে যাইতেন। ঘোড়ার পায়ের চাপে জমির ফসল নষ্ট হইয়া গেলেও কৃষকদের বাধা দিবার অধিকার ছিল না। সকল প্রকার সুখভোগ তাঁহারা করিতেন। সহরে বা রাজপ্রাসাদে থাকিয়া বিলাস সাগরে ভাসিতেন আর কৃষকদের নিকট হইতে অর্থ শোষণ করিতেন।

তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল বাকী সব লোক যেমন মধ্যবিত্ত, কারিকর, কৃষক, মজুর ইত্যাদি। ইহারা প্রথম তুই শ্রেণী হইতে সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে কৃষকদের অবস্থা যে কত খারাপ ছিল তাহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ। প্রভুদের প্রাপ্য মিটাইয়া তাহাদের সামান্য আয় হইতে যাহা থাকিত তাহা দ্বারা তাহারা কোন রকমে নিজেদের বাঁচাইয়া রাখিতে পারিত। ইহাদের মধ্যে মধ্যবিত্তদের অবস্থা কিছুটা ভাল ছিল কারণ তাঁহারা ছিলেন বুদ্ধিজীবী। কারিকরেরা ইচ্ছামত জিনিস তৈরী বা বিক্রয় করিতে পারিত না। তাহারা ধনিকদের দ্বারা পরিচালিত শিল্পসঙ্ঘ বা গিল্ডের সম্পূর্ণ অধীন ছিল। ধনীরা তাহাদিগকে ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজেরা

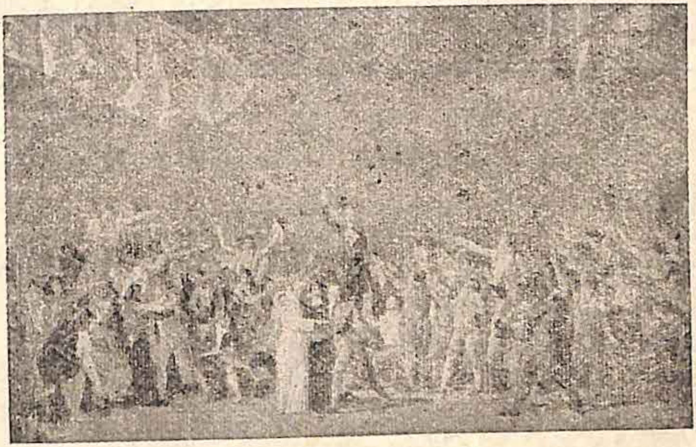
লাভবান হইতেন। তাহাদের অবস্থা এরূপ শোচনীয় ছিল যে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করাই ছিল তাহাদের ভাগ্য। ইহারা নগরে বাস করিত।

এইরূপ অবস্থায় লোকের মনে যে দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে। এই সময় ফরাসী দেশে মণ্টেস্কিউ, ভল্টেয়ার, রুশো প্রভৃতি বহু চিন্তাশীল লেখকের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা মূক জনগণের চাপা অসন্তোষ তীব্রভাষায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং ফ্রান্সের প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করিয়া উহা যে দেশের পক্ষে কত ক্ষতিকর তাহা প্রমাণ করিয়া দিলেন।

এই সময় আমেরিকায় স্বাধীনতার যুদ্ধে দলে দলে স্বেচ্ছা-সৈনিক যোগদান করিয়াছিল। তাহারা দেশে ফিরিয়া স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিল। আমেরিকার মুক্তিতে তাহাদের মনেও মুক্তির আশা জাগিয়া উঠিল।

রাজপ্রাসাদের অমিতব্যয়, বৈদেশিক যুদ্ধ, সরকারের অকর্ম্মণ্যতা ও সামন্তদের কর না দেওয়ার ফলে সরকারের আর্থিক সঙ্কট বাড়িয়া চলিয়াছিল। আমেরিকার যুদ্ধের পর উহা এক গুরুতর অবস্থায় পরিণত হইল। রাজা ষোড়শ লুই বিশেষ চেষ্টা করিয়াও এই অবস্থা হইতে উদ্ধারের কোন পথ পাইলেন না। অনন্যোপায় হইয়া তিনি জনগণের দাবি মানিয়া লইয়া ষ্টেট্স জেনারেল বা প্রতিনিধি সভা আহ্বান করিলেন (১৭৮৯ খৃঃ)। ষ্টেট্স জেনারেল ছিল ফরাসী দেশের ফিউডাল যুগের প্রতিনিধি সভা, অনেকটা ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের মত। কিন্তু ১৭৫ বৎসরের মধ্যে এই সভা কখনও ডাকা হয় নাই। এই সভা আহূত হইলে তৃতীয় শ্রেণীর জনসাধারণ—তাহাদের বহু দিনের সঞ্চিত

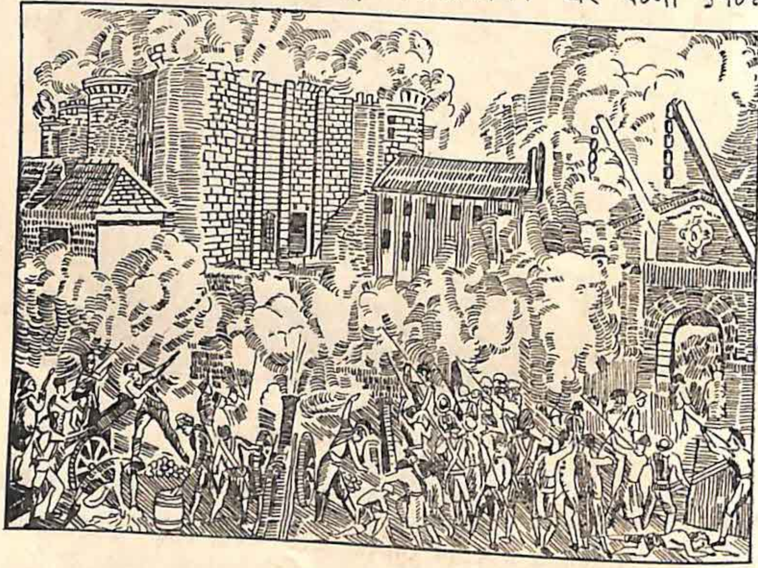
অভিযোগগুলির প্রতিকারের সুযোগ লাভ করিল। তাহারা প্রথম হইতেই তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইল। তাহারা



টেনিস কোর্টে শপথ গ্রহণ

ঘোষণা করিল যে তাহারাই জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি। রাজা তাহাদের আচরণ ও হাবভাব দেখিয়া ভীত হইয়া ষ্টেট্স জেনারেলের অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিলেন। তৃতীর শ্রেণীয় প্রতিনিধিরা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নিকটবর্ত্তী একটি টেনিস খেলার বাড়ীতে (টেনিস কোর্টে) যাইয়া এক সভা করে এবং সকলে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে নূতন শাসনতন্ত্র রচনা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের এই সংহতি কখনই ভঙ্গ করিবে না। শেষ পর্য্যন্ত রাজাকে জনগণের দৃঢ়তার কাছে নতিস্বীকার করিতে হইল। তিনি ষ্টেট্স জেনারেলকে জাতীয় পরিষদ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। জাতীয় পরিষদ নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিবার ভার গ্রহণ করিল। কিন্তু অস্থিরমতি রাজা এমন কতকগুলি কাজ

করিলেন যাহাতে পরিষদ ভীত হইয়া পড়িল। তখন প্যারির লোকেরা ক্ষেপিয়া যাইয়া ব্যাষ্টিলের দুর্গ আক্রমণ করিল। এই দুর্গটি বহুদিন ধরিয়া কারাগার রূপে ব্যবহৃত হইতেছিল। জনগণ দুর্গটিকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া বন্দীদের মুক্ত করিয়া দিল। এই ঘটনা ১৭৮৯



ব্যাষ্টিল দুর্গ আক্রমণ

খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে ঘটে। সেই দিন হইতে আজও ফরাসীগণ এই দিনটিকে জাতীয় দিবস বলিয়া পালন করিয়া আসিতেছে। ব্যাষ্টিল ধ্বংস করিয়া তাহারা প্যারিতে নূতন পৌর শাসনের ব্যবস্থা করিল এবং ইহার নাম দিল 'প্যারি কমিউন'। ইহা ছাড়া তাহারা জাতীয় বাহিনী নাম দিয়া একটি নূতন সামরিক বাহিনী গড়িয়া তুলিল।

প্যারির জনতার অনুকরণে অন্যান্য নগরেও কমিউন ও জাতীয় রক্ষীদল গঠিত হইল এবং গ্রামে কৃষকেরা বিদ্রোহ করিয়া জমিদারদের

কেল্লা ও কাছারি-বাড়ী বিনষ্ট করিয়া দিল এবং জমিদারী সংক্রান্ত সমস্ত দলিলপত্র পুড়াইয়া দিল।

ইহাতে সুবিধাবাদী সামন্তশ্রেণী ভীত হইয়া পড়িলেন এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে তাঁহারা স্বেচ্ছায় তাঁহাদের সমস্ত বিশেষ অধিকার-গুলি বাতিল করিয়া দিলেন। ইহার পর জাতীয় পরিষদ জাতীয় সংবিধান সভা নাম গ্রহণ করিল এবং নূতন শাসনতন্ত্র রচনায় মন দিল। প্রথমেই তাহারা 'মানবের অধিকার' (রাইট্‌স অব ম্যান) নাম দিয়া শাসন সংক্রান্ত কতকগুলি মূল আদর্শ স্থির করিয়া একখানি দলিলে লিপিবদ্ধ করিল। ইহাতে প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইল এবং সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করা হইল। ইতিমধ্যে প্যারিতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বুভুক্ষু মহিলার দল মিছিল করিয়া ভার্সাইর প্রাসাদে যাইয়া রাজা ও রাজপরিবারকে সঙ্গে লইয়া প্যারিতে ফিরিয়া আসিল এবং প্যারির রাজপ্রাসাদে আনিয়া তাঁহাদের বন্দীর মত করিয়া রাখা হইল। রাজা ও রাজার সঙ্গে জাতীয় সংবিধান সভাও প্যারিতে চলিয়া আসিল।

প্রায় ১৮ মাস পর্য্যন্ত দেশে মোটামুটি শান্তি বিরাজ করে। এই সময় একটি নূতন সংবিধানের খসড়া তৈরী করা হয় এবং আরও অনেক সংস্কারমূলক আইন পাশ করা হয়। রাজা ঐ আইনগুলি মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি ফরাসী দেশ ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য প্যারি হইতে পলায়ন করেন। কিন্তু ফরাসী দেশের সীমা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই ধরা পড়িয়া যান। সেখান হইতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনা হয়। পথে তাঁহাকে জনতার ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও অপমান সহ্য করিতে হয়। রাজার পলায়নের চেষ্টার ফলে

চরমপন্থীরা প্রবল হইয়া ওঠে। এতদিন ধীর ভাবে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছিল, এখন হইতে তাহার উপর চরমপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চরমপন্থীদের মধ্যে জ্যাকোবিন ও গিরোণ্ডিষ্ট নামে দুইটি দল ছিল। উহাদের মধ্যে জ্যাকোবিনরাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী দল।

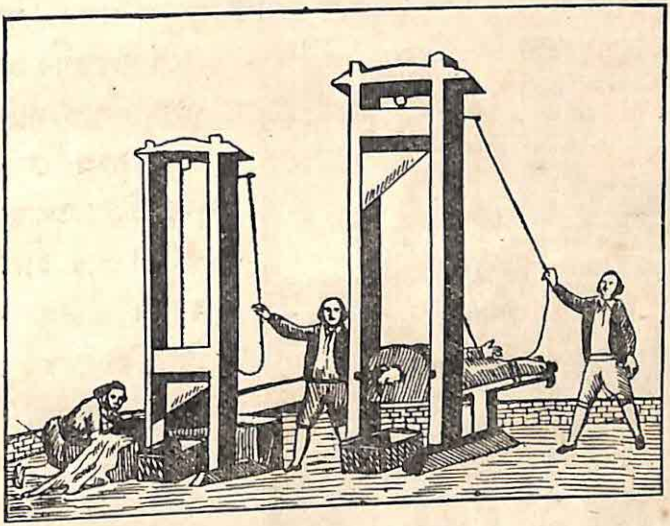


রাজা ষোড়শ লুই

এতকাল লোকের এ ধারণা ছিল না যে রাজা ছাড়া রাজ্য চলিতে পারে। রাজা ষোড়শ লুইকে ধরিয়া আনিবার পর তাহাকে কিছুদিন রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে দেওয়া হয় না। তখন লোকে দেখিল যে রাজার কোন আবশ্যকতা নাই, রাজা ছাড়া শাসনকার্য্য বেশ চলিতে পারে। ইহা হইতেই ফরাসী দেশে সাধারণ-তন্ত্রে বিশ্বাসী একটি ক্ষুদ্র দলেয় সৃষ্টি হয়। তাহাদের দলভারি হইতে কিছুটা সময় লাগিয়াছিল।

এ দিকে দুর্ব্বলচিত্ত রাজার আচরণে জনসাধারণের সহিত তাঁহার বিরোধ ক্রমে বাড়িয়া চলিল এবং তাহারা তাহার সততা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। তাহারা মনে করিল যে তিনি ফরাসী দেশে স্বৈরতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন। অবস্থা চরমে উঠিলে তাহারা অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। প্রথম দিকের কয়েকটি যুদ্ধে ফরাসীরা ভীষণভাবে পরাজিত

হইল। শত্রু সৈন্য অবাধে প্যারির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহাতে ফরাসীগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। উন্মত্ত জনতা রাজাকে বন্দী করিল এবং বিপ্লব-বিরোধী সন্দেহে বহু লোককে হত্যা করিল। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকেরা বিপ্লবের গান গাহিতে গাহিতে আসিয়া দেশরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিল। এই সময় তাহারা



গিলোটিন

যে গান গাহিয়াছিল তাহাই এখন ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত। ইহার পর রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া একটি প্রতিনিধি সভা গঠন করিল এবং রাজা ষোড়শ লুইকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ফ্রান্সে রাজার পদ তুলিয়া দেওয়া হইল।

রাজাকে হত্যা করা হইলে ফরাসীদেশের নানাস্থানে রাজভক্তরা বিদ্রোহ করে। দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। ইউরোপের অন্যান্য

রাজারাও ভীত হইয়া পড়েন; কারণ ফ্রান্সের রাজার মত অবস্থা তাঁহাদেরও হইতে পারে। প্রায় সমস্ত ইউরোপে রাজারা একত্র মিলিত হইয়া ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বৈদেশিক রাজাদের আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ শত্রুর হাত হইতে বিপ্লবকে বাঁচাইবার জন্য ফরাসী বিপ্লবীরা দেশের মধ্যে সন্ত্রাস রাজত্ব (রেন অব টেরার) আরম্ভ করিল এবং সামান্য সন্দেহে দেশের লোককে হত্যা করিতে লাগিল। ফরাসী দেশে নরহত্যার তাণ্ডব-লীলা চলিতে লাগিল। সহস্র সহস্র লোককে গিলোটিনের তলায় মাথা রাখিয়া প্রাণ হারাইতে হইল। এই ভাবে গিরোণ্ডিষ্টদলের নেত্রী মাদাম রোলান্দ, রাণী মেরী অ্যাণ্টয়নেট, রাজার এক ভাই, প্যারি নগরীর মেয়র প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে হত্যা করা হইয়াছিল। এই সন্ত্রাস রাজত্বের নায়কছিলেন রবস্‌পীয়ার, মেরাট ও দাঁতন। সন্ত্রাস রাজত্ব কি ভীষণ নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই বুঝিতে পারিবে।



মেরী অ্যাণ্টয়নেট

লা ভেণ্ডি নামক স্থানের লোকেরা বিদ্রোহ করিয়াছিল। তাহাদের কি ভাবে দমন করা হইয়াছিল শুনিলে তোমরাই ভয় পাইবে। প্রথমে হাজার হাজার লোককে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া গুলী করিয়া হত্যা করা হইল। ইহাতে সকল লোক হত্যা করিতে অনেক সময় লাগিবে বলিয়া দলে দলে লোকদের হাত পা বাঁধিয়া নৌকায় চাপাইয়া মধ্য নদীতে লইয়া নৌকা ডুবাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু সকলকেই এই ভাবে হত্যা করা হইল। নদীর জল মৃত দেহে ভরিয়া গেল।

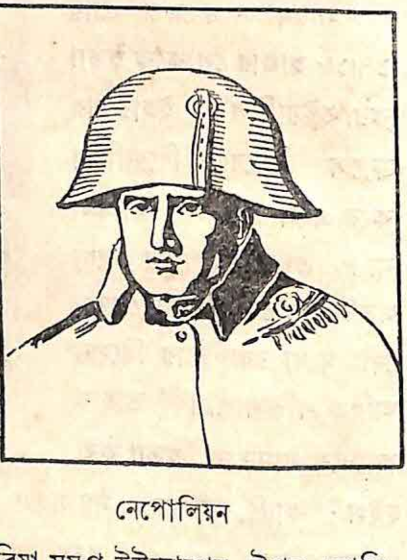


রবস্‌পীয়ার

লায়ন নগরের প্রায় ১৭।১৮ হাজার লোককে হত্যা করা হইয়াছিল। ইহার পর ফ্রান্সে বিপ্লবের বিরোধিতা করে এমন একজনও থাকিল না। তখন নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। নেতাদের মধ্যে রবস্‌পীয়ার ছিলেন অধিক শক্তিশালী। তাহার আদেশে দাঁনতকে হত্যা করা হইল; কারণ, দাঁতন সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। দাঁতনকে হত্যা করার পর রবস্‌পীয়ার অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইলেন এবং বেপরোয়া নরহত্যা দ্বারা এমন ত্রাসের সৃষ্টি করিলেন যে লোকে আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার বিরুদ্ধে

ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহারা অবশেষে রবস্‌পীয়ারকে বন্দী করিয়া গিলোটিনে ফেলিয়া হত্যা করিল। এইরূপে প্রায় ১৬ মাস সন্ত্রাসবাদ চলিবার পর উহার অবসান ঘটিল। কিন্তু এই সন্ত্রাসবাদীরা দেশের ভিতরের শত্রু ও বাহিরের শত্রুদের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। বিদেশী শত্রুদের পরাজিত করিয়া বহুস্থান অধিকার করিয়াছিল এবং ফরাসী রাজ্যের সীমানার বিস্তার সাধন করিয়াছিল। তাহারা অন্যান্য দেশকেও বিপ্লবনীতি গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইয়াছিল।

সন্ত্রাসবাদের অবসান হইলে নরমপন্থীদের উপর দেশ শাসন ও বিদেশী রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার ভার পড়িল। কিন্তু তাহারা এই সকল কাজে দক্ষতা দেখাইতে পারিলেন না। তাহাদের অকর্ম্মণ্যতা একটি যুবাবয়স্ক সৈনিককে তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতি সাধনের সুযোগ আনিয়া দিল। এই সৈনিকের নাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। বিপ্লব যে দুরবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা দূর করিয়া তিনি দেশে স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ১৫ বৎসর ধরিয়া সমগ্র ইউরোপের উপর আধিপত্য করেন। নিজের দেশে তিনি নরমপন্থী বিপ্লবীদের অনেকগুলি নীতি মানিয়া লইয়াছিলেন।



নেপোলিয়ন

যে আদর্শ লইয়া ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হয় শেষ পর্য্যন্ত তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে নাই। তথাপি ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঐ বিপ্লবের প্রভাবে যে নূতন সমাজ গড়িয়া ওঠে তাহা ইতিহাসে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া আছে। ফরাসীগণ যে পুরাতন পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল সেই অবস্থা তখন ইউরোপের সকল দেশেই বর্ত্তমান ছিল। বিপ্লবের আদর্শ সকল দেশের মনেই রেখাপাত করিয়াছিল। সুতরাং সেই আদর্শ অল্পদিনের মধ্যে ফরাসী দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল এবং ইউরোপের পরবর্ত্তী ইতিহাসের উপর প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিল।

অনুশীলনী

১। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল?

২। ফরাসী বিদ্রোহের পূর্ব্বে ফ্রান্সের অধিবাসীরা কয় শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল? প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সহিত তৃতীয় শ্রেণীর কি পার্থক্য ছিল?

৩। যখন বিদ্রোহ আরম্ভ হয় তখন ফ্রান্সের রাজা ছিলেন কে? তাঁহার বিষয় কি জান?

৪। ফরাসী বিদ্রোহের কারণ কি?

৫। ফ্রান্সে সন্ত্রাস-রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছিল কি কারণে? সন্ত্রাস-রাজত্ব সম্বন্ধে কি জান? সন্ত্রাসবাদের নিষ্ঠুরতার একটি উদাহরণ দাও।

৬। ফরাসী বিপ্লবের দেশে যিনি শান্তি ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন তাঁহার নাম কি?

৭। ফরাসী বিপ্লবের ফল কি হইয়াছিল?

অষ্টম অধ্যায়

শিল্প বিপ্লব

ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতার মূলে রহিয়াছে দুইটি যুগান্তকারী বিপ্লব। প্রথমটি হইতেছে ফরাসী বিপ্লব। ইহা ইউরোপে এক নূতন রাজনৈতিক আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল এবং ধীরে ধীরে পুরাতন শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল।

দ্বিতীয়টি হইল ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লব। ইহা ফরাসী বিপ্লবের মত হঠাৎ বা চমকপ্রদভাবে দেখা দেয় নাই, ইহা আসিয়াছিল নিঃশব্দে ও ধীরে ধীরে। শিল্প বিপ্লব জীবনধারণের এবং যোগাযোগ সাধনের পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছিল। এই বিপ্লব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইংলণ্ডে আরম্ভ হয় এবং পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করে।

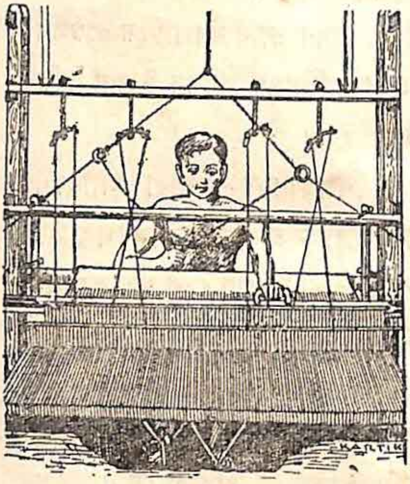
ইংলণ্ডে ষোড়শ শতাব্দী হইতে সাগরপথে বাণিজ্য করিয়া ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়া এক শ্রেণীর লোক প্রচুর লাভবান হইয়াছিল। তাহাদের হাতে বিপুল অর্থ মজুত হইতেছিল। প্রথমে তাহারা দেশের মধ্যে মজুত টাকা খাটাইয়া আরও লাভবান হইবার চেষ্টা করিল। পূর্ব্বে কারিকর ও মিস্ত্রীরা নিজেরাই জিনিস তৈরী করিয়া বাজারে বিক্রয় করিত। ধনীদের মধ্য হইতে একদল লোক কারিকরদের দিয়া জিনিস তৈরী করিয়া নিজেরা বাজারে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল এবং লাভের মোটা অংশটা নিজেরাই আত্মসাৎ করিতে লাগিল। ইহার

ফলে কারিকরগণ তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলিল। তাহারা মধ্যবর্ত্তী মহাজনদের অধীন হইয়া পড়িল এবং উভয়ের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক স্থাপিত হইল। কারিকরগণ শ্রমিকে পরিণত হইল। শিল্প বিপ্লব ভারি যন্ত্রপাতির প্রচলন করিয়া এবং কারখানার সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে জিনিস উৎপন্ন করিয়া এই পরিবর্ত্তন ত্বরান্বিত করিয়া দিয়াছিল।

শিল্প বিপ্লব যাঁহারা আনিয়াছিলেন তাঁহারা ফরাসী বিপ্লবের নেতাদের মত দেশের শাসনপদ্ধতির নিন্দা করেন নাই বা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিয়া দেশ জয় করেন নাই। তাঁহারা ছিলেন অতি সাধারণ লোক। নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া মানুষের প্রতিদিনের জীবন যাত্রা সহজ করিয়া দিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডের জনসাধারণের জীবনের ধারণা, বহু বৎসরের অভ্যাস ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি একেবারে বদলাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা যে সকল যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা বস্ত্র-শিল্প, কয়লা ও লৌহ-শিল্প, কৃষি ও সংবাহন ব্যবস্থার বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এই সকল আবিষ্কারের কথা জানিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, যে-সকল জিনিস আজ আমাদের কাছে অতি সাধারণ বলিয়া মনে হয় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে লোকে ঐগুলির অস্তিত্বের কথা ভাবিতেও পারে নাই।

বস্ত্র—প্রথমে বস্ত্রশিল্পের উন্নতির কথা বলিব। বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রগুলি আবিষ্কারের পূর্ব্বে অন্যান্য দেশের ন্যায় ইংলণ্ডেও হাতে সূতা কাটা হইত এবং হস্তচালিত তাঁতে কাপড় বোনা হইত। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে জেম্‌স হারগ্রীভ্‌স নামক একজন কাটুনি 'স্পিনিং জেনি' নাম দিয়া প্রথম একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। হাতে একটি সূতার বেশী একসঙ্গে কাটা

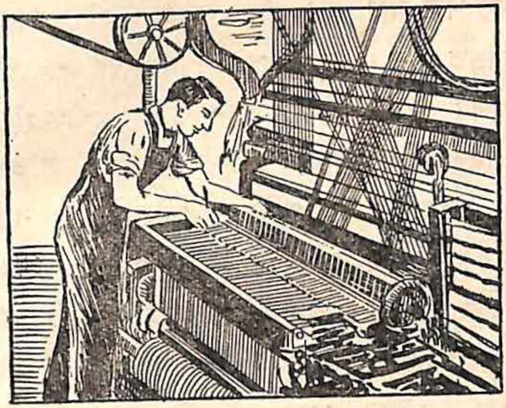
যায় না। স্পিনিং জেনির সাহায্যে একসঙ্গে ৮টি সূতা কাটা সম্ভব হইল। ইহার এক বৎসর পর রিচার্ড আর্ক্‌রাইট নামক একজন নাপিত আর একটি সূতাকাটার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ইহাদ্বারা একসঙ্গে আরও বেশী সূতা কাটা যাইত। ইহারও ১১ বৎসর পর স্যামুয়েল ক্রম্পটন স্পিনিং জেনি ও আর্করাইটের যন্ত্র একত্র করিয়া সূতাকাটার একটি উন্নত ধরণের যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। এই যন্ত্রের নাম তিনি দিয়াছিলেন 'মিউল'। এই যন্ত্র বাষ্প-শক্তিদ্বারা চালিত হইত এবং



হস্তচালিত তাঁত

একজন লোকের সাহায্যে একসঙ্গে ২ শত সূতা কাটা যাইত। সুতরাং পূর্ব্বেকার চেয়ে অনেক বেশী সূতা উৎপন্ন হইতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্ কে নামে একজন ঠকঠকি মাকু আবিষ্কার করিয়া বস্ত্রবয়নের উন্নতি করিয়াছিলেন। তাহার ৫৪ বৎসর পরে কার্টরাইট নামে একজন ধর্ম্মযাজক স্বয়ং চালিত (অটোমেটিক) তাঁত আবিষ্কার করেন। কার্টরাইটের যন্ত্রের দোষত্রুটি দূর করিয়া কার্য্যকরী করিতে আরও ৫০ বৎসর লাগিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঐ যন্ত্রের আরও উন্নতি করা হয়। এই সকল উন্নত যন্ত্র এখন কাপড়ের কারখানায় ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বে ২০০ তাঁতি যে

পরিমাণ কাপড় বুনিত একটি যন্ত্রে একদিনে একটা লোক সেই পরিমাণ কাপড় বুনিতে পারে। মিউলের ন্যায় এই যন্ত্রও বাষ্প-শক্তি দ্বারা চালিত হইত। সুতরাং ঐ সকল যন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পশক্তির ব্যবহারও প্রয়োজন হইয়া পড়িল। জল পাম্প করিবার জন্য বাষ্প-পরিচালিত ইঞ্জিনের ব্যবহার অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। নূতন বস্ত্রবয়নের উপযুক্ত করিয়া যিনি বাষ্প-পরিচালিত ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করেন তাঁহার নাম জেমস্ ওয়াট। তিনি একজন কারিকর ছিলেন। ১৭৮৫খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম এই বাষ্প-পরিচালিত ইঞ্জিন কাপড় বুনিবার কল চালাইবার জন্য ব্যবহার করা হয়।



যন্ত্রচালিত তাঁত



জেমস্ ওয়াট

লৌহ ও কয়লা—যন্ত্র তৈরী করিতে শক্ত জিনিসের প্রয়োজন হয়। লৌহ ও ইস্পাতের মত শক্ত আর কিছু নাই। বহুকাল হইতে লৌহ অস্ত্র তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হইত। নূতন যন্ত্রগুলি নির্ম্মাণের জন্য লৌহ ও ইস্পাতেরই প্রয়োজন হইল। কিন্তু তখন খনিজ লৌহ হইতে ব্যবহারের লৌহ নিষ্কাষণ করার পদ্ধতি ছিল অতিশয় সেকেলে। উহা দ্বারা একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে লৌহ-নিষ্কাষণ সম্ভব ছিল না। তখন কাঠকয়লার সাহায্যে লৌহ গলান হইত। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে লৌহ গলাইবার জন্য পাথুরিয়া কয়লা সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার করা হয়। পাথুরিয়া কয়লার সাহায্যে অধিক পরিমাণে লৌহ তৈরীর উপায়ও বাহির করা হইল। ফলে ইংলণ্ডে প্রচুর লৌহ উৎপন্ন হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে কয়লার প্রয়োজনীয়তাও বাড়িয়া গেল এবং উহার উৎপাদন প্রণালীরও উন্নতি করা হইল।

কৃষি—কৃষিরও যথেষ্ট উন্নতি করা হয়। পূর্ব্বে চাষীরা ছোট ছোট জমি চাষ করিয়া শস্য উৎপাদন করিত। চাষীদের মেয়েরা কুটিরশিল্পের দ্বারা তাহাদের আয় বাড়াইত। সেই আয় দ্বারা তাহারা একটু ভাল-ভাবে থাকিতে পারিত। কলকারখানা স্থাপিত হওয়ায় তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। কুটিরশিল্প নষ্ট হইয়া গেল। এই সময়ে ছোট জমি চাষ করিয়াও কোন লাভ হইত না। চাষীরা বাধ্য হইয়া জমি বিক্রয় করিয়া দিল। জমি কিনিলেন ধনীরা। তাঁহারা একেকজন প্রচুর জমির মালিক হইলেন। তাঁহাদের হাতে পড়িয়া কৃষি একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইল; তাঁহারা জমি চাষের উন্নত ধরণের পদ্ধতি

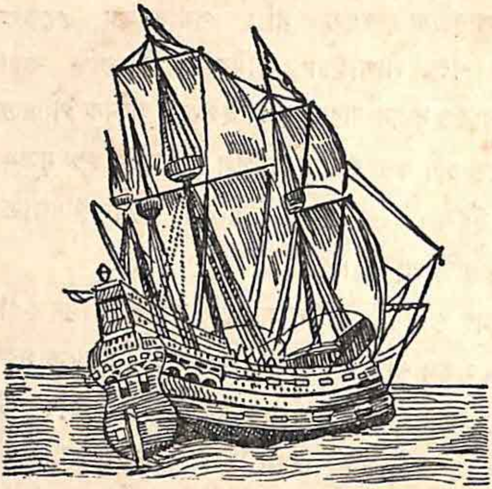
অবলম্বন করিলেন। জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য জমি এক বৎসর ফেলিয়া রাখার আর আবশ্যক হইল না। পর্যায়ক্রমে একেক বৎসর একেক প্রকারের শস্য লাগাইয়া জমির আয় বৃদ্ধি করা হইল। জমিতে সার দিবারও নূতন ব্যবস্থা করা হইল। অনেক পতিত জমি উদ্ধার করিয়া তাহাতে চাষ করা হইতে লাগিল। চাষের জন্য নূতন ধরণের যন্ত্রপাতি নির্ম্মিত হইল। এই সকল উন্নতির ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের অনেক উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইল।

বিজ্ঞানসম্মত ভাবে মেষ ও গবাদি পশুপালনের ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হইল। পশুদের জন্য নূতন নূতন খাদ্য আবিষ্কার করা হইল। ইহাতে গরু ভেড়ার চেহারা বদলাইয়া গেল। উহারা খুব হৃষ্টপুষ্ট হইল। একেকটি মেষের ওজন তিন গুণ ও একেকটি গরুর ওজন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল।

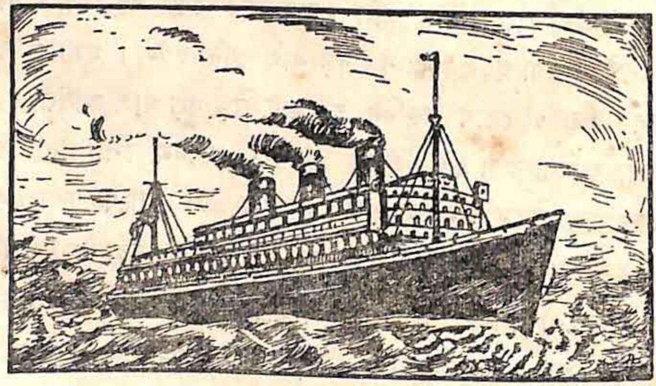
এই সময় কলকারখানাকে কেন্দ্র করিয়া অনেক নগর গড়িয়া উঠিল। এই সকল স্থানে যাতায়াতের জন্য এবং কয়লা প্রভৃতি কলকারখানার প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহের জন্য বহু উন্নত ধরণের রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইল এবং বড় বড় খাল কাটা হইল। হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইডেন প্রভৃতি দেশে বহুদিন হইতেই বড় বড় খাল কাটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা করা হইয়াছিল। ইংলণ্ড এতদিন পিছাইয়া ছিল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে প্রথম ৭ মাইল একটি খাল কাটিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারের সহিত একটি কয়লার খনির যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ইহার ফলে খালের ভিতর দিয়া নৌকা এবং পালতোলা জাহাজে করিয়া কয়লা সরবরাহ করা সহজ হয় এবং কয়লার দাম কমে। এইরূপে বহু খাল পরে কাটা হইয়াছিল।

খাল কাটিয়া জলপথে চলাচলের যেমন সুবিধা করা হইল স্থলপথে

গমনাগমনের জন্য তেমনি বড় বড় পাকা রাস্তাও করা হইল। এই সকল রাস্তা সহর-গুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে জন ম্যাকাডাম রাস্তাকে মসৃণ করিবার উপায় আবিষ্কার করেন। তাঁহার নাম অনুসারে এইরূপ মসৃণ করা রাস্তাগুলিকে ম্যাকডাম করা রাস্তা বলে। কলিকাতার রাস্তাগুলি ঐ ভাবে নির্ম্মিত। ভাল রাস্তা নির্ম্মিত হওয়ায় যানবাহন



পালতোলা জাহাজ



বাষ্প চালিত জাহাজ

চলাচলের সুবিধা হইল। কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া লোকে

আরও দ্রুত চলাচলের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। উপায়ও বাহির হইল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বাষ্পচালিত জাহাজ স্কটল্যাণ্ডের ক্লাইড নদীতে চালান হইল। এই জাহাজটির নাম ছিল কমেট। তাহার পরই নির্ম্মিত হইল রেল ইঞ্জিন। প্রথম রেল ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করেন জর্জ্জ ষ্টিফেনসন্। ইহা ঘণ্টায় ১৩ মাইল চলিত। এই ইঞ্জিনের নাম রকেট। ভাবিয়া দেখ ঘণ্টায় তের মাইল গতির ইঞ্জিন তখনকার লোকের মনে কি বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিল। তোমরা এখন বিরাট আকারের ইঞ্জিনকে ঘণ্টায় ৫০।৬০ মাইল বেগে যাইতে দেখ। ১৩ মাইল গতির কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই হাসিবে। কিন্তু মনে রাখিও রকেট হইতেই এই সকল দ্রুতগতিশীল বিরাটকায় ইঞ্জিনগুলির জন্ম হইয়াছে।


ষ্টিফেনসন্

ফলাফল—যন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সূতা, বস্ত্র ও লৌহের বড় বড় কারখানা স্থাপিত হইল। কারখানায় প্রচুর জিনিস উৎপন্ন হইতে লাগিল। ঐ সকল দ্রব্য বিদেশে বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ হইতে লাগিল। ইংলণ্ড ঐশ্বর্য্যে ভরিয়া উঠিল।

কলকারখানা যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল কারিকরগণ ততই বিপদে পড়িল। যন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাহারা পারিয়া উঠিল না। তাহারা ঘর বাড়ী ও কাজ ছাড়িয়া নগরে যাইয়া পুঁজিপতিদের প্রতিষ্ঠিত বিরাট কারখানায় মজুর খাটিতে আরম্ভ করিল। কারিকরদের কাজ আর কারখানার কাজের মধ্যে পার্থক্য অনেক। কারিকরগণ



প্রথম রেল ইঞ্জিন

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নিজের হাতে একটি জিনিস গড়িত কিন্তু কারখানায় একটি জিনিস তৈরী করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক নিযুক্ত করা হয়, অর্থাৎ একখানি কাপড় তৈরী করিবার যত রকমের কাজ আছে তাহা একজনে না করিয়া একেক রকমের কাজ একেক জনকে করিতে হয়। ইহাকে বলে 'ফ্যাক্টরি সিস্‌টেম' বা কারখানার রীতি। কায়িক পরিশ্রমকে ভাগ করিয়া দেওয়ার জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বহু অর্থব্যয় করিয়া বিরাট কারখানাগুলি ধনী লোকেরা যখন স্থাপন করিলেন, দলে দলে লোক গ্রাম ছাড়িয়া শ্রমিকের কাজের জন্য সেখানে আসিয়া ভীড় করিল। ফলে ঐ সকল স্থান জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। তাহাদের বাসের জন্য যে সকল বস্তি নির্ম্মিত হইল সেগুলি ছিল নিতান্ত কদর্য্য ও অস্বাস্থ্যকর। তাহাদের একঘেয়ে কাজ করিবার পর আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তাহা ছাড়া এই সকল শ্রমিকদের কাজের নিশ্চয়তাও কিছু ছিল না। মালিকের ইচ্ছামত তাহারা কাজ হইতে বরখাস্ত হইত। নানা কারণে লোক বেকার হইয়া পড়িতেছিল। সেই জন্য এত অসুবিধা সত্ত্বেও কারখানার কাজের জন্য প্রচুর লোক ভীড় করিতে লাগিল। ইহার সুযোগ লইয়া মালিকেরা খুব কম হারে মজুরি দিয়া অনেক বেশী খাটাইয়া লইতে লাগিলেন। মালিক-শ্রমিকের বিরোধ পরে এই কারণেই আরম্ভ হইয়াছিল।

এই সকল কারখানায় স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদেরও কাজে লাগান হইত ; কারণ ইহাদের খুব কম মজুরী দেওয়া চলিত। ইহাদের দিয়া মালিকেরা অতি নিষ্ঠুরভাবে কাজ করাইয়া লইতেন। বালক বালিকারা কাজ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলে উহাদের বেত্রাঘাত করা হইত। মজুরদের লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ দেওয়া হইত না।

ধনী মালিকদের এই সকল অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্রমে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। বহু বাধার পর ইংলণ্ডে প্রথম ফ্যাক্টরি আইন পাশ করিয়া বালক বালিকাদের কাজের সময় কমাইয়া দেওয়া হয়। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য পরে আরও আইন পাশ করা হয়। ঐ সকল আইনদ্বারা মালিকদের যথেচ্ছাচার অনেক স্থলে বন্ধ করা হইয়াছে।

বিরাট যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগাইতেছে। ইহাই হইল শিল্প বিপ্লবের স্থায়ী ফল।

অনুশীলনী

১। শিল্প বিপ্লব কাহাকে বলে? কোন্ সময়ে এবং কোথায় ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল?

২। শিল্প বিপ্লবের পূর্ব্বে ইংল্যাণ্ডে শিল্প উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল?

৩। শিল্প বিপ্লবের দ্বারা কি কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল?

৪। সূতা ও কাপড় বুনিবার জন্য নূতন নূতন যন্ত্র কে বা কাহারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন?

৫। যানবাহন ও কৃষির কি কি উন্নতি করা হইয়াছিল?

৬। শিল্প বিপ্লবের ফলে কৃষকদের জীবনে কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল? শ্রমিক শ্রেণীর উৎপত্তি কি করিয়া হইল?

৭। শ্রমিকদের প্রতি শিল্প-মালিকেরা কিরূপ ব্যবহার করিতেন? শ্রমিকদের জন্য আইন প্রণয়নের আবশ্যক হইয়াছিল কেন?

নবম অধ্যায়

ইটালী ও জার্ম্মানীর একীকরণ

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ফরাসী বিপ্লব লোকের মনে নূতন রাজনৈতিক চেতনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। লোকের মনে প্রবলভাবে ধারণা জন্মিয়াছিল প্রত্যেক জাতির নিজের একটি রাষ্ট্র থাকিবে এবং রাষ্ট্রটি হইবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেই সময় হইতে পৃথিবীতে সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব মানব এই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। এই আদর্শ হইতেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে দুইটি বৃহৎ আধুনিক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এই দুইটি রাষ্ট্রের নাম হইল ইটালী ও জার্ম্মানী। এই দুইটি দেশ বহুকাল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। উহাদের মধ্যে কোন একতা ছিল না।

নেপোলিয়ন ঐ দুইটি দেশই জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার আক্রমণে ঐ দুইটি দেশের লোক যে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছিল তাহাই তাহাদের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য প্রেরণা আনিয়া দিয়াছিল। বহুদিন নেপোলিয়নের শাসনাধীনে থাকিবার ফলে তাহারা বুঝিয়াছিল যে তাহাদের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির ঐক্য সাধন করিয়া একটি রাজ্য গঠন করা সম্ভব।

ইটালী—ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বে ইটালী বলিতে একটি রাজ্য বুঝাইত না। ইহা ছিল একটি দেশের নাম। ঐ দেশটি তখন লোম্বার্ডি, মোডেনা, পার্মা প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত

ছিল। ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল বিদেশী রাজাদের অধীন। লোম্বার্ডি ছিল অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত। মোডেনা, পার্মা এবং টাস্কানিতে অষ্ট্রিয়ার রাজবংশের আত্মীয়গণ রাজত্ব করিতেন। ইটালীর মধ্যবর্ত্তী স্থান জুড়িয়া ছিল পোপের রাজ্য। দক্ষিণে ছিল নেপ্‌লস্ রাজ্য। ইহার রাজা ছিলেন ফরাসী রাজবংশের। পশ্চিমে ছিল সার্ডিনিয়া রাজ্য। ইহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিতেছ যে ইটালী একটি রাজ্য ছিল না। শুধু তাই নয়, ইহার বেশীর ভাগই ছিল বিদেশীর অধীনে। পোপ ধর্ম্মগুরু হইয়াও স্বাধীন রাজার সম্মান পাইতেন। নানা রকমের নানা রাজ্যে বিভক্ত ইটালী ছিল ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল।

নেপোলিয়ন প্রায় সমগ্র উত্তর ইটালী জয় করিয়াছিলেন। ইটালীর অধিবাসীরা প্রথমে তাঁহাকে মুক্তিদাতা বলিয়া মনে করে এবং সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করে কিন্তু পরে তাহাদের ভুল ভাঙ্গে। তথাপি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে ৬০ বৎসর পরে ইটালীতে যে ঐক্যের আন্দোলন আরম্ভ হয় এইখানেই হয় তাহার সূচনা।

নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ানদের ইটালী হইতে বিতাড়িত করেন এবং পোপের রাজ্যের কিছু অংশ জয় করেন। ভিনিস ও জেনোয়াও তাঁহার অধিকারে আসে। নেপোলিয়ন এই সকল রাজ্যগুলিকে লইয়া দুইটি সাধারণতন্ত্রী রাজ্য গঠন করেন। পরে (১৮০৫ খৃঃ) তিনি নিজেকেই ইটালীর রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। উত্তর ইটালী একটি মাত্র রাজ্যে পরিণত হইল। ফলে ইটালীতে ঐক্যের আদর্শ স্থাপিত হইল।

নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর বড় বড় রাজন্যবর্গ ভিয়েনার কংগ্রেসে মিলিত হইয়া নেপোলিয়ন ইটালীতে যে রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন

তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া আবার উহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত করিলেন। ভিনিস অষ্ট্রিয়ার থাকিল এবং লোম্বার্ডি সে ফিরিয়া পাইল। একমাত্র সার্ডিনিয়া-পিডমণ্ট রাজ্যটি একজন স্বাধীন ইটালীয়ান রাজার শাসনে থাকিল। নেপ্‌লস রাজ্য ফরাসী রাজবংশের একজনকে দেওয়া হইল। ইটালী আবার পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

ইটালী পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসিল; কিন্তু নেপোলিয়ন উত্তর ইটালীতে যে ঐক্যের আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার ধ্বংস হইল না। ১৮১৫ সাল হইতে ইটালীতে ঐক্য সাধনের ও অষ্ট্রিয়ার হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য চেষ্টা চলিতে লাগিল। সর্ব্বত্র গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিল কার্বোনারি দল। তাহারা দুইবার বিদ্রোহ করে। অষ্ট্রিয়া দুইবারই কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করে। কিন্তু মুক্তি আন্দোলনকে নির্ম্মূল করিতে পারে না। নানাস্থানে বিদ্রোহীরা গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া মুক্তি আন্দোলনকে জাগাইয়া রাখিল। ইহার পর ম্যাজিনি ইয়ং ইটালী নাম দিয়া একটি নূতন দল গড়িয়া তোলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে পিডমণ্টের রাজা চার্লস অ্যালবার্ট অষ্ট্রিয়ানদের ইটালী হইতে তাড়াইবার জন্য যুদ্ধ করেন কিন্তু যুদ্ধে হারিয়া যাইয়া নিজ পুত্র ভিক্টর ইমানুয়েলকে রাজ্য দিয়া সিংহাসন ত্যাগ করেন। ইমানুয়েল খাঁটি ইটালীয়ান এবং দেশভক্ত ছিলেন।

মুক্তিকামী ইটালীয়ানরা তাহারই উপর তাহাদের আশাভরসা স্থাপন করিল। এইরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহারা যে ভুল করে নাই তাহা ইটালীর মুক্তি-সাধকদের কাহিনী পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবে। যাঁহারা ইটালীর মুক্তি সংগ্রামকে সফলতার পথে লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ম্যাজিনি, ক্যাভুর ও গ্যারিবল্ডির নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

প্লম্বিয়ার্সের সন্ধিতে তৃতীয় নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইটালীর স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দান করেন।

ফ্রান্সের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি পাইয়া ক্যাভুর পিডমণ্টে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অষ্ট্রিয়ার রাজা পিডমণ্ট আক্রমণ করেন। তৃতীয় নেপোলীয়নের সাহায্যে ক্যাভুর অষ্ট্রিয়ার রাজাকে পরাজিত করেন। লোম্বার্ডি পিডমণ্টের হস্তগত হয়। ইহার পর ইটালীর অনেকগুলি রাজ্য স্বেচ্ছায় পিডমণ্টের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হয়। এইরূপে ইটালী একীকরণের পথে প্রথম অগ্রসর হইল। ম্যাজিনি যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন ক্যাভুর তাঁহার রাজনৈতিক বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা তাহা সার্থক করিয়া তুলিলেন।



গ্যারিবল্ডি

গ্যারিবল্ডি—এই বারে আসিলেন ইটালীর মুক্তি সংগ্রামে অসম সাহসী যোদ্ধা জেনারেল গ্যারিবল্ডি। তিনি তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ লালকোর্ত্তা-বাহিনী লইয়া যাইয়া নেপ্‌লস ও সিসিলি জয় করিলেন এবং পিডমণ্টের রাজার হস্তে ঐ দুইটি রাজ্য অর্পণ করিলেন। ক্রমে অন্যান্য রাজ্যগুলিও পিডমণ্টের সঙ্গে যুক্ত হইল। এইরূপে বিচ্ছিন্ন

ইটালী একটি রাজ্যে পরিণত হইল। পিডমণ্টের রাজা ইমানুয়েল এই রাজ্যের রাজা হইলেন।

জার্ম্মানী—ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বে জার্ম্মানী ছিল ৩৬০টি স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্টি মাত্র। এইগুলির মধ্যে কোন ঐক্যের বন্ধন ছিল না। উহারা রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল কিন্তু উহাদের উপর রোমান সম্রাটের কোনরূপ ক্ষমতাই ছিল না। তিনি নামেই মাত্র সম্রাট ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন অষ্ট্রিয়ার শাসক। জার্ম্মানীর রাজ্য-গুলির মধ্যে একটি বড় রাজ্য ছিল। তাহার নাম প্রুশিয়া। ইহার রাজা মহান ফ্রেডারিক একজন সুদক্ষ ও ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। তিনিই প্রুশিয়াকে গৌরবের আসনে বসাইয়াছিলেন এবং উহাকে জার্ম্মানীর একটি প্রধান রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

নেপোলিয়ন যখন উইরোপের রাজ্যগুলি একটি একটি করিয়া জয় করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি জার্ম্মানীর কতকগুলি রাজ্যও জয় করিয়াছিলেন এবং 'তথায় রাইনের যুক্তরাষ্ট্র বা 'কনফেডারেশন অব দি রাইন' নামে একটি রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিলেন।

নেপোলিয়ন রাইনের যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়া বিচ্ছিন্ন জার্ম্মানীতে ঐক্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন। জার্ম্মানীর রাজ্যগুলি পরস্পর হইতে এতই বিচ্ছিন্ন ছিল যে ঐ গুলির অধিবাসীরা কখন ভাবিতেই পারে নাই যে এতগুলি সম্পূর্ণ আলাদা রাজ্য একত্র করিয়া একটি জার্ম্মান রাজ্য গঠিত হইতে পারে এবং উহার শাসনকার্য্যের পরিচালনা সুচারু-ভাবে হইতে পারে। নেপোলিয়নের কার্য্যদ্বারা উহা যে সম্ভব সে বিশ্বাস তাহাদের মনে স্থান পাইল।

নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনাতে ইউরোপের রাজন্যবর্গ মিলিত হইয়া জার্ম্মানীর রাজ্যগুলি লইয়া একটি অসংবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিলেন। যাহাদের লইয়া এই রাজ্যটি গঠিত হইল তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্যের অভাব রহিয়া গেল। উৎসাহী জার্ম্মানরা এই ব্যবস্থায় হতাশ হইলেন না। ঐক্য ও শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা জার্ম্মানীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে অন্যান্য দেশের ন্যায় জার্ম্মানীতে ব্যাপকভাবে গণ-আন্দোলন আরম্ভ হইল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই আন্দোলনও ব্যর্থ হইল।

অবশেষে বিসমার্ক কঠোর নীতি দ্বারা প্রুশিয়ার নেতৃত্বে সমগ্র জার্ম্মানীকে একত্র করিয়া জার্ম্মান সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন।

ফরাসী বিপ্লবের পর জার্ম্মান রাজ্যগুলি লইয়া অষ্ট্রিয়ার নেতৃত্বে একটি জার্ম্মান ফেডারেশন গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে জার্ম্মানগণ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জার্ম্মান রাজ্যগুলির মধ্যে প্রুশিয়াই ছিল সবচেয়ে বড়। প্রুশিয়া ইটালীর ন্যায় জার্ম্মানীতে জার্ম্মান রাজ্যগুলিকে একত্র করিয়া একটি জার্ম্মান রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহা সফল হয় নাই। জার্ম্মান রাজ্যগুলিকে একত্র করিয়া যিনি জার্ম্মান সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন তাঁহার নাম বিসমার্ক। বিসমার্ক এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি প্রুশিয়ার রাজ-সরকারে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু ঐ কাজ তাঁহার ভাল না লাগায় উহা ছাড়িয়া দেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রুশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়মের আহ্বানে তিনি প্রধান-মন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণ করেন। বিসমার্ক মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিলে জার্ম্মানীর নবযুগ আরম্ভ হইল। বিসমার্ক ছিলেন ঐ যুগের ইউরোপের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁহার ছিল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং দৃঢ় মনোবল, রাজনীতিতে তিনি ছিলেন যাদুকরের ন্যায় কৌশলী। প্রুশিয়ার

রাজার অধীনে জার্ম্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান সঙ্কল্প। তিনি বলিয়াছিলেন যে জার্ম্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইলে কেবল বক্তৃতা দ্বারা হইবে না—চাই যুদ্ধ ও রক্তপাত। তিনি কাজেও তাহাই করিয়াছিলেন। প্রথমে প্রুশিয়ার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ও তাহাদের যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া তিনি পর পর যুদ্ধ করিয়া জার্ম্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং জার্ম্মানীর সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন।



বিসমার্ক

জার্ম্মানীকে একীকরণের জন্য তিনি প্রথমে ডেনমার্ক, পরে অষ্ট্রিয়া এবং সর্ব্বশেষে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রত্যেককে পরাজিত করিয়াছিলেন। জার্ম্মানী হইতে অষ্ট্রিয়ার আধিপত্য দূর করিয়া দিয়া প্রুশিয়ার রাজাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। এইরূপে বিসমার্ক তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় জার্ম্মানী এক মহাশক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

অনুশীলনী

১। ফরাসী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে ইটালীর অবস্থা কিরূপ ছিল? নেপোলিয়ন ইটালী অধিকার করিবার পর ঐ অবস্থার কি পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল? ২। ভিয়েনার কংগ্রেসে ইটালী সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইয়াছিল? ৩। কাহাদের চেষ্টায় ইটালী স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল? ৪। ম্যাজিনি, ক্যাভুর ও গ্যারিবল্ডির বিষয় কি জান? ৫। নেপোলিয়ন জার্ম্মানী জয় করিবার পূর্ব্বে জার্ম্মানীর অবস্থা কি ছিল? নেপোলিয়ন উহার কি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন? ৬। জার্ম্মানীর একীকরণ কাহার চেষ্টায় হইয়াছিল? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান?

দশম অধ্যায়

আমেরিকায় ক্রীতদাসের দাসত্ব মোচন

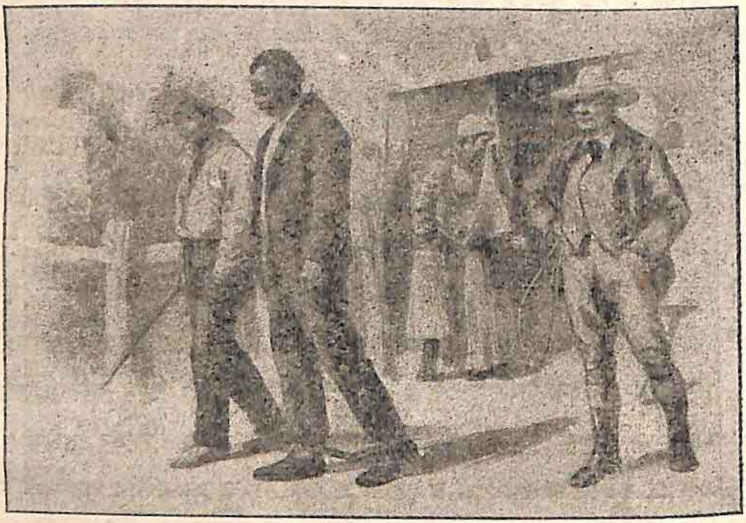
অতি প্রাচীনকালেও ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন ছিল। প্রাচীন গ্রীকেরা তাহাদের কাজকর্ম্মে সাহায্য করিবার জন্য ক্রীতদাস রাখিত। আমাদের দেশেও রাজা হরিশ্চন্দ্র নিজেকে বিক্রয় করিয়া ক্রীতদাস হইয়াছিলেন। কুতুবদ্দীন ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার স্থাপিত রাজবংশ দাস বংশ নামে পরিচিত। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যে এই প্রথা সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। দাস বিক্রয়ের বাজার ছিল। মানুষ যেমন গৃহপালিত পশু ক্রয় করিয়া ইচ্ছামত তাহাদের সুখ সুবিধার জন্য খাটাইয়া লয়, তেমনি মানুষ ক্রয় করিয়া তাহাদের পশুর মতই খাটাইয়া লওয়া হইত। ইহাদেরই ক্রীতদাস বলা হয়। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে ক্রীতদাস প্রথা উঠিয়া যায়।

ইউরোপীয়গণ যখন সমুদ্র পার হইয়া সুদূর সাগরতীরে উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিল তখন উপনিবেশ স্থাপনকারী জাতিগুলি এই প্রথার আবার প্রবর্ত্তন করিল। ইহাদের প্রবর্ত্তিত দাসত্ব প্রথা প্রাচীন রোমান প্রথারই অনুরূপ ছিল। আমেরিকার উষ্ণ প্রদেশগুলিতে যখন তাহারা আঁখ ও তামাক ও তূলার চাষ আরম্ভ করিল তখন তাহারা দাসত্ব প্রথার উপকারিতা বুঝিতে পারিল। শ্রমিকের অভাবে গরম দেশে মাঠে কাজ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ জন্য সমুদ্রে গমনাগমনকারী জাতিগুলি আফ্রিকার উপকূল হইতে নিগ্রোদের ধরিয়া

জাহাজে বোঝাই করিয়া আমেরিকায় লইয়া যাইয়া সেখানকার ভূস্বামীদের কাছে গরু বাছুরের মত বিক্রয় করিত। ইহাতে তাহাদের প্রচুর লাভ হইত এবং ঐ জাতিগুলির মধ্যে দাস ব্যবসা লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। যাহারা আফ্রিকার জঙ্গলাকীর্ণ দেশে উন্মুক্ত স্বাধীন জীবন যাপন করিত তাহাদের জাহাজের অস্বাস্থ্যকর ও অপরিসর স্থানের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া আমেরিকায় বিক্রয়ের জন্য লইয়া যাওয়া হইত। যত বেশী নিগ্রোকে এক জাহাজে লওয়া যাইত তত বেশী লাভ হইত। সেইজন্য উহাদের হাত-পা বাঁধিয়া ঘেষাঘেষি করিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখা হইত। এত কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া উহাদের শতকরা প্রায় ১২ জন মরিয়া যাইত। তাহাদের মৃতদেহ সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইত। আমেরিকায় দাস বিক্রয়ের বড় বড় আড়ৎ ছিল। সেখানে উহাদের লইয়া যাইয়া ভাল করিয়া কয়দিন খাওয়াইয়া সুস্থ করিয়া নীলামে বিক্রয় করা হইত। যাহারা উহাদের ক্রয় করিত তাহারা উহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত। ক্রীতদাসদের প্রভুর ক্ষেতে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রৌদ্র ও গরমের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করিতে হইত। কাহারো কাজ একটু কম হইলে অমনি ওভারসিয়ার আসিয়া বেত্রাঘাত করিত, লাথি মারিত এবং আরও নানা প্রকারে সাজা দিত। আঘাতের ফলে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে কপালে আলপিন ফুটাইয়া দিত। তাহাতে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তখনই আবার কাজ করিতে হইত। অনেক সময় প্রহারের ফলে শরীর দিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িত তথাপি কাজ করিতে হইত। স্ত্রী পুরুষ সকলেরই সমানভাবে খাটিতে হইত। উভয়ের প্রতি ব্যবহারও একই রকম করা হইত। হ্যারিয়েট রিচার্ড ষ্টো লিখিত 'টম কাকার কুটীর' নামে প্রসিদ্ধ

পুস্তক পাঠ করিলে এই হতভাগ্য ক্রীতদাসদের কিরূপ মর্ম্মান্তিক দুঃখ ও নিষ্ঠুর নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত তাহা জানিতে পারা যায়।

আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বত্র এই নিষ্ঠুর ব্যবসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে



মিষ্টার হেলি (বেত হাতে) টমকে কিনিয়া পায় শিকল পরাইয়া লইয়া যাইতেছেন। টমের স্ত্রী তাহার শিশুকন্যার গায়ে হাত রাখিয়া কাঁদিতেছেন।

লোকের মনে যে মানবতার ভাব জাগরিত হয় তাহারই ফলে বহু চেষ্টায় এই প্রথার অবসান ঘটে। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড তাহার উপনিবেশ-গুলিতে দাসত্ব প্রথা রদ করিয়া দেয়।

দাসত্ব প্রথা লইয়া উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে একটা বড় রকমের অন্তর্যুদ্ধ হইয়াছিল। দাসত্ব প্রথা চলিতে দেওয়া

হইবে কিনা এই প্রশ্ন লইয়া যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশের সহিত দক্ষিণাংশের মধ্যে মতদ্বৈধ হয়। উত্তরাংশের লোকেরা নির্ভর করিত শিল্প ও বাণিজ্যের উপর আর দক্ষিণাংশের লোকেরা করিত চাষ আবাদ। শিল্প বাণিজ্যের জন্য ক্রীতদাসের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় স্বাধীন শ্রমিকের। সেই জন্য তাহারা এই প্রথা রদ করিয়া দিয়াছিল। দক্ষিণাংশের লোকেরা ইহার বিরোধিতা করিতে লাগিল, কারণ তাহাদের চাষ আবাদ ক্রীতদাস ছাড়া চলিতে পারে না। ইহা ছাড়া এই সময় যুক্তরাষ্ট্রে আরও নূতন নূতন রাজ্যের উৎপত্তি হইতে লাগিল। ঐ রাজ্যগুলিতে ক্রীতদাস প্রথা চলিতে দেওয়া হইবে কি না তাহা লইয়া দুই অংশের মধ্যে মতভেদ আরও তীব্র হইয়া ওঠে। ৪০ বৎসর ধরিয়া ইহা লইয়া বাদ প্রতিবাদ চলিতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে হয় দক্ষিণাংশ ভিন্ন হইয়া যাইবে এবং যুক্তরাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া যাইবে, না হয় উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবে। উত্তরাংশের রাজ্যগুলিতে দাসত্বপ্রথা বিরোধী দল প্রবল হইয়া উঠিল। তাহারা আব্রাহাম লিঙ্কনকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের পদে নির্ব্বাচিত করিল। লিঙ্কন ছিলেন দাসত্ব প্রথার বিরোধী।

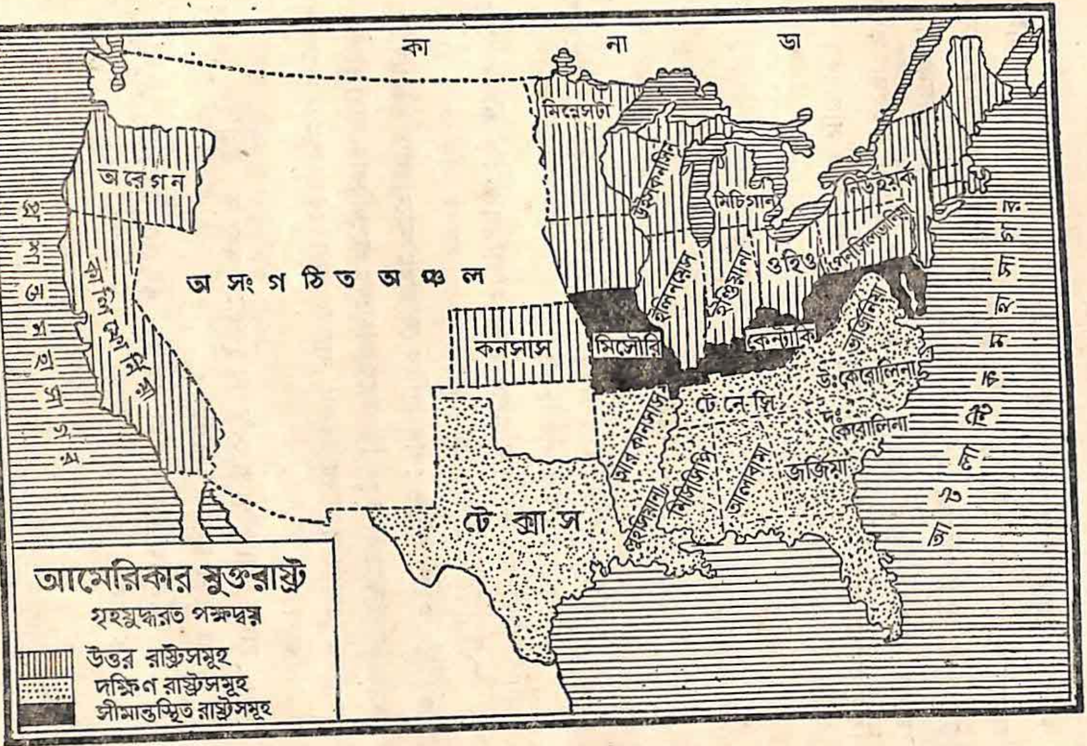


আব্রাহাম লিঙ্কন

দক্ষিণের রাজ্যগুলি ইহাতে ভীত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র হইতে নিজেদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভিন্ন একটি রাষ্ট্র গঠন করিল। ফলে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ পাঁচ বৎসর চলিয়াছিল। যুদ্ধ যখন চলিতেছিল তখন লিঙ্কন ক্রীতদাস প্রথা রদ করিয়া একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন।

পাঁচ বৎসর যুদ্ধের পর উত্তরের জয় হইল এবং যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। নিগ্রো ক্রীতদাসেরা মুক্ত হইয়া আমেরিকার নাগরিক অধিকার লাভ করিল। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার প্রদান অনেকে সমর্থন করিতে পারিলেন না। দক্ষিণের লোকেরা নিগ্রো নির্য্যাতনের উদ্দেশ্যে কু ক্লুক্স ক্ল্যান নামে একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করিল। আজও আমেরিকা হইতে কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ দূর হয় নাই ; যদিও দুইএর মধ্যে সকল প্রকার প্রভেদ তুলিয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে।

আব্রাহাম লিঙ্কন—আব্রাহাম লিঙ্কন একজন বিরাট পুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সামান্য অবস্থা হইতে তিনি আমেরিকার সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করিয়াছিলেন কেবল নিজের একনিষ্ঠ পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসের দ্বারা। তাঁহার চেহারা ছিল কৃষ ও লম্বা। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা হইতে কিছুতেই তিনি বিচ্যুত হইতেন না, কেহ তাঁহার ভুল দেখাইয়া দিলে তিনি তাহা স্বীকার করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। প্রেসিডেণ্ট হইয়াও তাঁহার আচরণের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ছোট বড় সকলের সহিতই তিনি অতি কোমল ব্যবহার করিতেন। তিনি ছিলেন জনগণের প্রিয়। তাঁহার কথা আলোচনা



আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র
গৃহযুদ্ধরত পক্ষদ্বয়
উত্তর রাষ্ট্রসমূহ
দক্ষিণ রাষ্ট্রসমূহ
সীমান্তস্থিত রাষ্ট্রসমূহ
কা না ডা
অ সং গ ঠি ত অ ঞ্চ ল
অরেগন
ক্যালিফোর্নিয়া
প্রশান্ত মহাসাগর
মিনেসোটা
উইসকনসিন
মিচিগান
নিউইয়র্ক
পেনসিলভানিয়া
ওহিও
ইণ্ডিয়ানা
ইলিনয়েস
কনসাস
মিসৌরি
কেন্টাকি
ভার্জিনিয়া
উঃ কেরোলিনা
দঃ কেরোলিনা
টেনেসি
আরকানসাস
লুইসিয়ানা
মিসিসিপি
আলাবামা
জর্জিয়া
টেক্সাস
আটলান্টিক মহাসাগর

করিতে গেলে মহাত্মা গান্ধীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহার অন্তঃকরণ কোমল হইলেও তিনি যাহা ন্যায্য বা সত্য বলিয়া মনে করিতেন তাহা পালন করিতে তাঁহার দৃঢ়তা ছিল অনমনীয়। দেশের কল্যাণ তিনি চিন্তা করিতেন, স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া কখন কিছু করেন নাই। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ ছিল অতি সাধারণ।

অনুশীলনী

১। ক্রীতদাস বলিতে কি বোঝায়? ইউরোপে প্রাচীনকালে কোনদেশে ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন ছিল?

২। আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন হইয়াছিল কেন? ক্রীতদাসদের দিয়া কি কাজ করান হইত?

৩। কোন্ দেশ হইতে কোন্ জাতির লোকদের আমেরিকায় লইয়া যাইয়া বিক্রয় করা হইত? কি ভাবে তাহাদের আমেরিকায় আনা হইত?

৪। ক্রীতদাসদের উপর কিরূপ ব্যবহার করা হইত তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৫। দাসত্ব প্রথা লইয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্যুদ্ধ হইয়াছিল কেন? এই যুদ্ধের ফল কি হইয়াছিল?

৬। আমেরিকায় দাসত্ব প্রথা কে রদ করিয়াছিলেন? তাঁহার বিষয় কি জান?

——

একাদশ অধ্যায়

এশিয়া ও আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের উৎপত্তি

যে সময় ইউরোপীয়গণ সমুদ্র পার হইয়া সুদূর দেশ আবিষ্কার করিতে লাগিল, সেই সময় হইতেই তাহারা ঐ সকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করিল। তখন হইতে ক্রমে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া এই তিনটি মহাদেশে ইউরোপীয় সভ্যতা স্থাপিত হয়। ঐ তিনটি মহাদেশ কৃষ্টিতে, ভাষায় এবং সভ্যতায় সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় হইয়া গিয়াছে। ইংরাজগণ ভারতে, ওলন্দাজগণ ইন্দোনেশিয়াতে এবং রুশিয়েরা উত্তর এশিয়া ও মধ্য এশিয়ার চীন, ভারত ও পারস্যের সীমা পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকার বিস্তার করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা চরম সাফল্য লাভ করে। প্রায় সমস্ত পৃথিবীতে ইউরোপীয়দের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। শিল্প বিপ্লব হইতে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা নূতন করিয়া উৎসাহ লাভ করে—ঐ বিপ্লবের ফলে বিরাট বিরাট কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সকল কারখানায় প্রচুর মাল উৎপন্ন হইতে লাগিল। উপনিবেশগুলি এই সকল উৎপন্ন মাল বিক্রয় করিবার ও কারখানার প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল সংগ্রহ করিবার সুবিধা করিয়া দিল। ইহা ছাড়া নূতন নূতন দ্রুতগামী যান বাহন নির্ম্মিত হওয়ায় দূরে গমনাগমনের ও সুবিধা হইয়াছিল।

এই দুইটি কারণে ইউরোপের ছোট বড় সকল জাতির মধ্যেই উপনিবেশ লইয়া কাড়াকাড়ি লাগিয়া গেল। পৃথিবীর দুর্ব্বল ও অনগ্রসর জাতিগুলিকে দোহন ও শোষণ করিতে সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সভ্য শ্বেতাঙ্গরা এই শোষণ কার্য্যের একটি মার্জিত নামকরণ করিল। তাহারা বলিল অনগ্রসর জাতিগুলিকে সভ্য ও শিক্ষিত করিয়া তোলাই তাহাদের উদ্দেশ্য। তাহাদের উপর এই ভার আপনা হইতেই আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং উহারা ইহার নাম দিল 'শ্বেতাঙ্গের বোঝা' বা হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন।

শ্বেতাঙ্গরা এই দায়িত্ব পালন করিবার জন্য নিগ্রো ও নানা অসভ্যজাতির বাসভূমি আফ্রিকা মহাদেশটিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার জন্য উদ্যোগী হইল।

উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্য্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশটি ছিল অজানা। এই জন্য ইহাকে বলা হইত অন্ধকার মহাদেশ বা ডার্ক কন্টিনেণ্ট। ঐ মহাদেশের উপকূলবর্ত্তী মাত্র কয়েকটি স্থান ছিল তাহাদের পরিচিত। উহার ভিতরকার স্থানগুলি সম্বন্ধে তাহারা কিছুই জানিত না। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লিভিংষ্টোন নামে একজন পর্য্যটক দক্ষিণ আফ্রিকায় ভ্রমণ করিয়া সেখানকার দেশগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া হেনরী ষ্ট্যানলি নামে আর একজন ইংরাজ আফ্রিকা পরিভ্রমণ করিয়া আফ্রিকার অনেক অজানা স্থানের সন্ধান বাহির করেন। এই দুইজন অদ্ভুত সাহসী দৃঢ়চেতা পর্য্যটক অন্ধকার মহাদেশের দ্বার খুলিয়া দিয়া অন্ধকার দূর করিলেন।

আফ্রিকা অনুসন্ধান কারিদের মধ্যে ডাঃ লিভিংষ্টোন ছিলেন সর্ব্বপ্রধান। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি আফ্রিকার দক্ষিণে

কেপ কলোনিতে গমন করেন। আফ্রিকায় অনেক প্রকার আদিম জাতি বাস করিত। সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অরণ্য এবং পাহাড়, মরুভূমি, জলপ্রপাত, হ্রদ ও নদী ছিল। নদীগুলিতে বহু কুমীর ও ভয়ঙ্কর হিপোপোটেমাস বাস করিত। উহাদের জন্য নৌকায় চলাফেরা করাও ছিল বিপজ্জনক। উহারা নৌকা আক্রমণ করিয়া মানুষ ধরিয়া খাইত। ঐ সকল স্থানে যেমন বৃষ্টি হইত তেমনি পড়িত গরম। এইরূপ আবহাওয়ার জন্য জ্বর রোগ খুব বেশিও হইত। এই সকল বিপদ উপেক্ষা করিয়া লিভিংষ্টোন ২৫ বৎসর ধরিয়া বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে একবার ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান। কিছু পরেই আবার আফ্রিকায় চলিয়া আসেন এবং আরও পাঁচ বৎসর টেঙ্গানিয়াকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি ঘুরিয়া বেড়ান। এই সময় তাঁহার খাদ্য সামগ্রী, অর্থ ও ঔষধ পত্র সমস্ত লুঠ হইয়া যায়। তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। ইংলণ্ডে গুজব রটিয়া যায় যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে হেনরী ষ্ট্যানলি নামে একজন ইংরাজকে তাঁহার অনুসন্ধান করিবার জন্য পাঠান হয়। ষ্ট্যানলি আসিয়া তাঁহাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখিতে পান। ইহার পর লিভিংষ্টোন কঙ্গো নদীর উৎপত্তি স্থলের সন্ধানে বাহির হন। বহু কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দেহ সসম্মানে ইংলণ্ডে লইয়া আসিয়া সমাধিস্থ করা হয়।

লিভিংষ্টোন জাম্বেসি নদীর গতিপথ, কঙ্গো নদীর উপরের অংশ ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত এবং টাঙ্গানাইকা ও নায়েগ্রা হ্রদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছিলেন।

ষ্ট্যানলির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। লিভিংষ্টোনের খোঁজ লইতে আসিয়া ষ্ট্যানলি কিছু দিন তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। লিভিংষ্টোনের মৃত্যুর পর তিনি আফ্রিকায় ফিরিয়া আসেন এবং বহু বিপদসঙ্কুল পথ দিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। তাঁহাকে নানা বিপদের মুখে পড়িতে হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে আমরা আফ্রিকার ঘন অরণ্যের কথা, বিপদসঙ্কুল নদীর কথা, পিগমি জাতীয় বামনদের কথা জানিতে পারি। তিনি আড়াই বৎসর আফ্রিায় ছিলেন।

ইহার পরেই আফ্রিকার ভূমি লইয়া ইউরোপীয়দের মধ্যে কাড়াকাড়ি লাগিয়া গেল। ফরাসীদের প্রচেষ্টায় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সুয়েজ খাল খোলা হয়। ইহাদ্বারা ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা হইল এবং সাগর পথের দৈর্ঘ অনেক কমিয়া গেল। কিন্তু মিশরের উপর ফরাসীদের প্রভাব অনেক বৃদ্ধি পাইল। বহু দিন ধরিয়াই মিশরের প্রতি ইংলণ্ডের লুব্ধ দৃষ্টি ছিল। মিশরের উপর ফরাসী প্রভাব স্থায়ী হইবে ইহা তাহারা সহ্য করিতে পারিল না। মিশরের খেদিভের (শাসন কর্ত্তা) সুয়েজ খালের অনেক শেয়ার বা অংশ ছিল। ইংরাজরা ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে খেদিভের নিকট হইতে সমস্ত শেয়ার ক্রয় করিয়া লইল এবং সুয়েজ খালের উপর তাহাদের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিল। ক্রমে তাহারা মিশর ও নীল নদের সমগ্র উপত্যকার উপর তাহাদের প্রভুত্ব স্থাপন করিল। খেদিভ নামে মাত্র শাসন কর্ত্তা রহিলেন। দেশরক্ষা ও শাসনকার্য্য ইংরাজরাই করিতে লাগিল। ইহার পর ইউরোপীয়গণ নিজেদের মধ্যে আফ্রিকা ভাগ করিয়া লইল। সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা ইংলণ্ডের অধীনে আনা হইল। অবশ্য এ জন্য তাহাকে কয়েকটি যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। উত্তর উপকূলে মরক্কো হইতে টিউনিস

পর্য্যন্ত এবং সাহারা মরুভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর ফ্রান্সের অধিকার স্থাপিত হইল। ইহার নাম হইল ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা। জার্ম্মানীর অধিকারে আসিল জার্ম্মান পূর্ব্ব আফ্রিকা, জার্ম্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা এবং বেলজিয়াম লাভ করিল কঙ্গো প্রদেশ। ইটালীর হস্তে আসিল পূর্ব্বে সোমালিল্যাণ্ড ও ইরিট্রিয়া এবং উত্তরে ট্রিপোলি।

এশিয়াতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা বিস্তার করিল রাশিয়া। সমগ্র সাইবিরিয়াতে রাশিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল এবং এশিয়ার পূর্ব্ব উপকূলে ভ্লাডিভষ্টোকে একটি বন্দর নির্ম্মাণ করিল। মধ্য এশিয়ায় রাশিয়া তুর্কীস্থান এবং তাসখেন্দ, সমরকন্দ, খিভা ও বোখারা অধিকার করিয়া পারস্য ও আফগানিস্থানের সীমানা পর্য্যন্ত তাহারা অধিকার বিস্তার করিল।

চীনের বিশাল সাম্রাজ্যর উপরও সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয়দের লোলুপ দৃষ্টি পড়িল। নিজ নিজ ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য তাহারা চীনকে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ভাগ করিয়া লইল। চীন হংকং, সাংহাই প্রভৃতি কয়েকটি বন্দরে ইংলণ্ডের ও অন্যান্য বৈদেশিকদের বাণিজ্যের অধিকার দিতে বাধ্য হইল। ফ্রান্স ক্যাথলিকদের উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার আদায় করিয়া লইল। রাশিয়া আমুর প্রদেশ অধিকার করিয়া লইল এবং ফ্রান্স ইন্দোচীনে তাহার সাম্রাজ্য স্থাপন করিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও চুপ করিয়া থাকিল না। সে চীনের অদূরে ফিলিপাইন ও হাওয়াই দ্বীপ অধিকার করিল। এইরূপে ইউরোপীয়গণ সমগ্র পৃথিবীতে তাহাদের আপন আপন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল।


গ্রীনল্যাণ্ড
ইউরোপ
রাশিয়া
সাইবেরিয়া
মঙ্গোলিয়া
তিব্বত
চীন
ভারত
আফ্রিকা
প্রশান্ত মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
দক্ষিণ আমেরিকা
অস্ট্রেলিয়া
ইউরোপ ও আমেরিকার উপনিবেশ
বৃটিশ
ফরাসী
ডাচ
জার্মান
বেলজিয়াম
আমেরিকা
ইটালী
পর্তুগাল
রাশিয়া
স্পেন

ইউরোপীয়দের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহার দুইটি দিক লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি হইল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিযোগিতার ফলে ইউরোপীয়দের মধ্যে বহু বিবাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হইয়াছিল—যেমন মিশর লইয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে, টিউনিস লইয়া ইটালী ও ফ্রান্সের মধ্যে এবং নিউগিনি লইয়া ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীর মধ্যে। দ্বিতীয়টি হইল প্রাচ্য দেশগুলিতে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশানুরাগের জন্ম। প্রথমটি বহুলাংশে প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য দায়ী। দ্বিতীয়টি এশিয়ার ইতিহাসকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করিয়াছে—এশিয়ায় নবজাগরণ আনিয়া দিয়াছে।

অনুশীলনী

১। ইউরোপ ছাড়া কোন্ কোন্ দেশে ইউরোপীয় সভ্যতা স্থাপিত হইয়াছে ?

২। শিল্প বিপ্লবের সহিত ইউরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপনের কি সম্পর্ক ছিল ?

৩। 'শ্বেতাঙ্গের বোঝা' কাহাকে বলে ?

৪। অন্ধকার মহাদেশ কোনটি ? এই দেশের দুর্গম স্থানগুলির সন্ধান যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম কি ?

৫। লিভিংষ্টোন ও হেনরী ষ্ট্যানলীর বিষয় যাহা পড়িয়াছ তাহা লেখ।

৬। আফ্রিকা মহাদেশের কোন্ কোন্ স্থান কোন্ কোন্ ইউরোপীয় জাতি নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছিল ?

৭। এশিয়ার কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ ইউরোপীয় জাতি উপনিবেশ বা প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল ?

৮। সমগ্র পৃথিবীতে ইউরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপনের ফল কি হইয়াছিল ?

দ্বাদশ অধ্যায়

চীন ও জাপানের অভ্যুত্থান

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত চীন ও জাপানের দরজা বহির্জগতের নিকট অবরুদ্ধ ছিল। বাহিরের কোন জাতি ঐ তুইটি দেশে প্রবেশ করিত পারিত না। এই তুইটি দেশের বর্ত্তমান যুগের ইতিহাসে যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনি পার্থক্যও আছে। চীন ও জাপানের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পাশ্চাত্য শক্তিগুলি বহুদিন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু ঐ তুইটি দেশ বিদেশীদের প্রবেশাধিকার দিতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চাপে পড়িয়া উভয় দেশ বিদেশী শক্তিগুলিকে প্রবেশ করিবার অধিকার দিতে বাধ্য হইয়াছিল। চীনে প্রথম প্রবেশ করে ইংলণ্ড আর জাপানে প্রথম প্রবেশ করে আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র। এই পর্য্যন্ত চীন ও জাপানের একই ইতিহাস। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতির বলপূর্ব্বক প্রবেশের প্রতিক্রিয়া উভয় দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দিল। উভয়েই উন্নতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিল। সুপ্রাচীন ও সুসভ্য চীন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সহ্য করিতে পারিল না। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অস্বীকার করিয়া পাশ্চাত্য জাতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার মত শক্তি অর্জ্জন করিতেও সক্ষম হইল না। চীন শোষিত লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ওদিকে জাপান মনেপ্রাণে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

ইংরাজগণ চীনে সর্ব্বপ্রথমে ক্যাণ্টন বন্দরে বাণিজ্য করিবার অনুমতি-লাভ করিয়াছিল। কিন্তু চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অনুমতি বহু চেষ্টা করিয়াও ইউরোপীয়গণ পাইল না। প্রতিবারেই উহা প্রত্যাখ্যান করা হইল। এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া পাশ্চাত্য শক্তিগুলি বল-প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। বলপ্রয়োগ দ্বারা সুবিধা আদায় করিবার প্রথম উদ্যোক্তা হইল ইংলণ্ড। ইংরাজগণ চীনে অহিফেনের ব্যবসা করিয়া লাভবান হইতেছিল। কিন্তু অহিফেনের কুফল হইতে চীনাদের রক্ষা করিবার জন্য চীন সরকার অহিফেন আমদানী নিষিদ্ধ করিয়া দিল। ইংরাজ এত সহজে এমন লাভের ব্যবসা ছাড়িতে পারে না। তাহারা যুদ্ধ করিল। যুদ্ধে চীনের পরাজয় ঘটিল। চীন ইংলণ্ডকে হংকং প্রদান করিয়া এবং পাঁচটি বন্দরে ইংরাজ বণিকদের বাণিজ্য করিবার অধিকার দিয়া সন্ধি করিল (১৮৪২ খৃঃ)। এই যুদ্ধকে অহিফেনের যুদ্ধ বলা হয়। ইহাই হইল পাশ্চাত্যের সহিত চীনের প্রথম সংঘর্ষ। এইরূপে চীনের দ্বারা কেবল ইংরাজদের জন্য নয় অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতিগুলির প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত হইল। হংকং বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটি বিখ্যাত নৌঘাঁটি ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হইল। ক্রমে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগুলি আসিয়া ঐ পাঁচটি বন্দরে বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া লইল।

অহিফেনের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় ইউরোপীয় শক্তিবর্গ চীনের আত্মরক্ষার শক্তির অভাবের পরিচয় পাইল। এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রই চীনের উপর তাহাদের প্রভাব স্থাপন করিতে আরম্ভ করিল। ফলে চীন আরও অনেকগুলি বন্দর, ইউরোপীয়দের বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিল। কোন ইউরোপীয়দের

উপর চীনদেশের আইন প্রযোজ্য হইবে না—তাহারা তাহাদের স্ব স্ব রাষ্ট্রের আইনের অধীনে থাকিবে—এইরূপ অপমানজনক সর্ত্তও চীনকে মানিয়া লইতে হইল।

জাপান ইউরোপীয়দের অনুকরণে শিল্পোন্নতির দিকে মন দিল এবং সামরিক উৎকর্ষতা লাভের জন্য ইউরোপীয় ধরণে সৈন্য সংগঠন করিতে লাগিল। সামরিক শিক্ষায় পাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণ করিয়া এবং অল্পদিনের মধ্যেই সে সর্ব্ব বিষয়ে ইউরোপীয়দের সমান হইয়া উঠিল। চীনের মত জাপানকেও ইউরোপীয়দিগকে নানা সুবিধা প্রদান করিতে এবং বহু অপমান জনক সন্ধির সর্ত্ত মানিয়া লইতে হইয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল যে—নিজের শক্তির পরিচয় না দিতে পারিলে ঐ সকল চুক্তির নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইবার কোন উপায় নাই। চীনে সে প্রথম তাহার শক্তির পরিচয় দিল। ইউরোপীয়দের মত জাপান চীনে ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকার দাবী করিল। কোরিয়ার আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুবিধা লইয়া জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই যুদ্ধ একবৎসর চলিবার পর চীন পরাজয় স্বীকার করিল। ইহাকে সিনো-জাপানীজ বা চীন-জাপানের যুদ্ধ বলা হয়। ইহার ফলে চীনের নিকট হইতে জাপান পোর্ট আর্থার বন্দর, ফরমোসা দ্বীপ ও বাণিজ্যের সুবিধা লাভ করিল। কোরিয়ার উপর জাপানের প্রভুত্ব চীনকে স্বীকার করিতে হইল।

জাপান চীনকে এত সহজে পরাজিত করায় চীনের দুর্ব্বলতা বেশী করিয়া প্রকাশ পাইল। চীনদেশের উপর পাশ্চাত্য জাতিগুলি দ্রুত-বেগে তাহাদের অধিকার দৃঢ় করিতে আরম্ভ করিল এবং নিজ নিজ প্রভাব-ক্ষেত্র তৈরী করিয়া সমগ্র দেশটাকে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা

করিতে লাগিল। সর্ব্বপ্রকারে চীন শোষিত ও লাঞ্ছিত হইতে লাগিল।

এইরূপ দুরবস্থায় পড়িয়া চীন সচেতন হইয়া উঠিল। শোষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবর্ত্তনের জন্য আগ্রহশীল হইয়া উঠিল। অনেকেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার দিকে মন দিল। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হইল না। প্রতিক্রিয়াশীল দল ইহার বিরোধিতা করিল। বিদেশীদের জন্যই তাহাদের এই দুরবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে মনে করিয়া তাহারা পাশ্চাত্য সকল কিছুর উপরই দারুণ বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইতে লাগিল। ফলে চীনে বিদ্রোহ হইল এবং ইউরোপীয়দের উপর অত্যাচার চলিতে লাগিল। ইউরোপীয়গণ মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিল, এবং নিষ্ঠুর ভাবে বিদ্রোহ দমন করিল। এই যুদ্ধ বক্‌সার বা মুষ্টিযোদ্ধার যুদ্ধ বলিয়া পরিচিত। চীন বিদেশীর হস্তে আরও লাঞ্ছিত হইল। চীন দেশে ইউরোপীয় সৈন্য বসান হইল।

ইহার পর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রুশের সহিত যুদ্ধে জাপান জয়ী হইলে পাশ্চাত্য শাসনপদ্ধতি ও শিক্ষার আবশ্যকতা চীনের জনসাধারণ অনুভব করিতে লাগিল। সামরিক শক্তিতে চীনকে বলীয়ান করিবার জন্য জাপানী শিক্ষক আনিয়া সৈন্য বাহিনীকে ইউরোপীয় আদর্শে শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। বিদেশী প্রভাব মুক্ত হইবার জন্য জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হইল। বহু পূর্ব্বেই 'তরুণ চীন' আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। ইহারা পাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর 'তরুণ চীন' আন্দোলন তীব্রতর হইয়া উঠিল। সর্ব্বত্র জাতীয় আন্দোলন দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইল। দক্ষিণাঞ্চলে মাঞ্চুরাজবংশের বিরোধী একটি সাধারণতন্ত্রীদল তাহাদের নেতা ডাঃ সান ইয়াট সেনের নেতৃত্বে শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ডাঃ সান ইয়াট সেন নানকিংএ

অস্থায়ী সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং উহার প্রেসিডেণ্ট হইলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি মাঞ্চুবংশের বালক রাজাকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। চীনে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইল। সান ইয়াট সেনের দলের নাম ছিল কুয়োমিনটাং। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল মাঞ্চুবংশের উচ্ছেদ, সাধারণতন্ত্র স্থাপন এবং রাশিয়ার সহিত মিত্রতা করা।

সাধারণতন্ত্রী চীন একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় নাই। কুয়োমিনটাং দল শক্তিশালী হইলেও বহু দল উপদল চীনে ঐক্য সাধনের অন্তরায় হইল। জাপান চীনের প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। সে চীনের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের দাবী করিল। কুয়োমিনটাং চীনকে তাহাই মানিয়া লইতে হইল। ইহাতে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগিল। তাহারা নিজ নিজ এলাকায় সমরঘাঁটি



সান ইয়াট সেন

নির্ম্মাণ কারল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চীন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে মিত্র শক্তির পক্ষে যোগদান করিল। তাহার আশা ছিল যুদ্ধে জয়লাভ

হইলে সে ইউরোপীয়দের নিকট হইতে তাহাদের অধিকৃত অংশগুলি ফিরাইয়া পাইবে এবং অপমানকর সন্ধিগুলি বাতিল করিয়া দিবে—চীনের জাতীয় গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে ; কিন্তু তাহার এ আশা পূর্ণ হয় নাই। প্যারির শান্তি সম্মেলনে চীনের সমস্ত দাবী অগ্রাহ্য হইল।

সান ইয়াট সেনের মৃত্যুর পর চীনের ভিন্ন ভিন্ন দলগুলির মধ্যে সংঘর্ষ প্রতিদিনই ঘটিতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন অংশের দলপতিরা স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। অবশেষে কুয়োমিনটাং আবার একটি শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠা করিল। চিয়াং কাইশেক তাহার প্রেসিডেণ্ট হইলেন। সমগ্র চীন আবার একই শাসনের অধীনে আসিল।



চীয়াং কাইসেক

কিন্তু কুয়োমিনটাং এর চরমপন্থীদল রাশিয়ার নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া চীনে কমিউনিজম বা সমাজ-তন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন দল গঠন করিল। কুয়োমিনটাং হইতে তাহারা আলাদা হইয়া গেল। পরবর্ত্তী দশ বৎসর চিয়াং কাইশেক ও কমিউনিষ্টদের মধ্যে বহু সংঘর্ষ হয় এবং বহু রক্তপাত হয়। তুই দল চীনের বিভিন্ন অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া চীনকে বিভক্ত করিল।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিয়া তথায় এক তাবেদার সরকার স্থাপন করিয়া তাহার আধিপত্য কায়েম করিল। ইহার পর সে খাস চীনের একটি প্রদেশ অধিকার করিয়া লইল। কিন্তু ইহাতেও চিয়াং কাইশেক বিচলিত হইলেন না। তিনি তোষণ নীতি গ্রহণ করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। সুবিধা পাইয়া ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে জাপান তড়িৎগতিতে চীন অধিকার করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ অকারণ আক্রমণে চীনের জনগণের মধ্যে নূতন দেশাত্মবোধ ও জাতীয় ঐক্য আনিয়া দিল।

জাপান—ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে জাপানের সামাজিক আচার নিয়ম অনেকটা আমাদের দেশেরই অনুরূপ ছিল। তাহারা বৃহৎ পরিবারে একত্র বাস করিত। সমগ্র পরিবারের স্বার্থের জন্য পরিবারের লোকজনদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইত। পরিবারের কর্ত্তা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। কোন গুরুতর সমস্যা দেখা দিলে তিনি আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহার মীমাংসা করিতেন। পিতা মাতা কনে দেখিয়া পুত্রের বিবাহ স্থির করিতেন। জাপানীরা লোক নিন্দার ভয় খুব বেশি করিত। তাহারা খুব মিশুক ও আলাপী ও সরল ছিল।

জাপানের লোকেরা ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—ক্ষত্রিয়—যুদ্ধই যাহাদের বৃত্তি ছিল, কৃষক—যাহারা জমি চাষ করিত, কারিগর—যাহারা হাতে কাজকরিয়া শিল্প দ্রব্য উৎপাদন করিত, এবং বণিক—যাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান ছিল ক্ষত্রিয়দের। তাঁহাদের হাতেই ছিল দেশের সামরিক শক্তি। তাঁহারাই জাপানে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন সামরিক শ্রেণীর আভিজাত্য। সামরিক শ্রেণীর মধ্যে একদল ছিলেন যাঁহাদের বলা হইত সামুরাই। সামুরাইগণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনার কার্য্যে তাঁহারা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতেন। নৌ ও

সেনা বিভাগের বড় বড় পদগুলি তাঁহারাই অধিকার করিতেন। সমাজে তাঁহারা ছিলেন সম্মানিত। পদ মর্য্যাদায় তাঁহাদের সমতুল্য আর কেহ ছিল না।


সামুরাই

ইউরোপীয়দের প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জাপান বহির্জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। বাহিরের সহিত তাহার কোন যোগাযোগ ছিল না। দেশ শাসনের ভার ছিল সম্রাটের উপর। অতি প্রাচীন কাল হইতে মিকাডো বংশের সম্রাটেরা জাপানে রাজত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু নামে মাত্রই তাঁহারা সম্রাট ছিলেন। রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা ছিল শোগান বা সামরিক শাসন-কর্ত্তার হাতে। তিনিই রাজ্য শাসন করিতেন। তাহা হইলেও জাপানীদের কাছে সম্রাট ছিলেন সাক্ষাৎ দেবতা। তাহারা তাঁহাকে দেবতার মতই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত।

বহুকাল ধরিয়া জাপান বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। কোন বিদেশীর ঐ দ্বীপটিতে প্রবেশাধিকার ছিল না। সর্ব্বপ্রথম জাপানকে বিশ্বদৃষ্টির সম্মুখে আনয়ন করিলেন আমেরিকার একজন নৌ-সেনাপতি কমোডোর পেরী। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র চারিখানা যুদ্ধ জাহাজ দিয়া কমোডোর পেরীকে জাপানে প্রেরণ করেন। তিনি জাপানের সম্রাটের নিকট আমেরিকার ব্যবহারের জন্য কয়েকটি বন্দর ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করেন এবং ভয় দেখাইয়া যান যে যদি তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয় তবে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া

পড়িবে। এক বৎসর পর পেরী ৮ খানা জাহাজ লইয়া ফিরিয়া আসেন। জাপানের সম্রাট পেরীর দাবী মানিয়া লইতে সম্মত হন এবং দুইটি বন্দর আমেরিকানদের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেন। ইহার পর জাপান বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশগুলির সহিত সন্ধি করিয়া বাণিজ্যিক সুবিধা দান করে। বাণিজ্যের সুবিধা ছাড়াও কিন্তু ইউরোপীয়গণ এমন সর্ত্ত আদায় করিয়া লইয়াছিল যাহা জাপানের পক্ষে ছিল খুবই অপমান জনক। এই সর্ত্ত অনুসারে জাপানে কোন ইউরোপীয় অপরাধ করিলে জাপানের আইনের দ্বারা তাহাদের বিচার করা চলিত না। তাহারা জাপানে থাকিয়াও জাপানের কর্ত্তৃত্ব মানিত না।



জাপানের সম্রাট

এইরূপে জাপান ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসিয়া বুঝিতে পারিল যে ঐ সকল বিদেশীদের দাবি উপেক্ষা করিবার শক্তি তাহার নাই। আত্মরক্ষার মত শক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে ইউরোপীয় সভ্যতাকে গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন পন্থা নাই। ইউরোপীয় পদ্ধতির দ্বারাই ইউরোপীয়দের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হইবে। ইহার পর হইতেই জাপানে রাষ্ট্রনৈতিক, সামরিক ও

শিল্প সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন অতি দ্রুতভাবে চলিতে লাগিল। তাহারা মনে প্রাণে ইউরোপীয় সভ্যতাকে গ্রহণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিল। সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া তাহারা সম্রাটকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিল এবং ইউরোপীয় ধরণে শিক্ষিত করিয়া স্থায়ী সৈন্যদল গঠন করিল। সকল রকম অতিরিক্ত সুবিধা ও মর্য্যাদা তুলিয়া দিয়া সকলকেই সমান অধিকার দেওয়া হইল। ক্ষত্রিয়শ্রেণীর আভিজাত্য আর থাকিল না। তাহারাও সাধারণের শ্রেণীভুক্ত হইল। ইউরোপীয়দের অনুকরণে সর্ব্ববিষয়ে আমুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। পাশ্চাত্য আদর্শে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইল। রাজধানী টোকিওতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল। শিক্ষা দিবার জন্য ইউরোপ হইতে শিক্ষকদের নিযুক্ত করিয়া আনা হইল। ফলে শিক্ষায় জাপান দ্রুত উন্নতি করিতে লাগিল। জাপানীরা ইউরোপীয় পোষাক পরিচ্ছদ গ্রহণ করিল। সৈন্যদিগকে আধুনিক অস্ত্রের প্রয়োগ শিক্ষা দিবার জন্য জার্ম্মানী হইতে শিক্ষকদের আনা হইল। তাহারা জার্ম্মানীর আদর্শে জাপানী সৈন্যদের শিক্ষিত করিয়া তুলিল। ইংলণ্ডের অনুকরণে নৌবাহিনী গঠিত হইল। শিল্প প্রচেষ্টাতেও তাহারা পিছাইয়া রহিল না। জাপানে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও শিল্প পদ্ধতি তাহারা শিখিয়া ফেলিল। অতি অল্পদিনের মধ্যে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, জাহাজ ও পোতাশ্রয় নির্ম্মিত হইল। এমনকি রাজনীতি ক্ষেত্রেও ইউরোপীয় পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তাহারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া পার্লামেণ্ট গঠন করিল। জাতির উন্নতির জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিনা রক্তপাতে এইরূপ বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন ইতিহাসে বিরল। এত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও জাপানীরা কখনও

স্বজাত্যবোধ বিসর্জ্জন দেয় নাই। মনে প্রাণে তাহারা প্রাচ্যই রহিয়া গিয়াছে।

জাপান এই খানেই ক্ষান্ত হইল না। সে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ নীতিও গ্রহণ করিল। দেশের বাহিরে তাহার ক্ষমতা বিস্তারের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার উপর তাহার লোলুপ দৃষ্টি পড়িল।

রাজনীতিতে, সামরিক শক্তিতে, বুদ্ধিতে ও শিক্ষায় জাপান ইউরোপীয়দের সমকক্ষ হইয়া বুঝিতে পারিল শক্তির পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত সে পাশ্চাত্য জাতির সমান মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিবে না। তাহার শক্তির পরীক্ষা দিবার জন্যই সে কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার দিকে দৃষ্টি দিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জাপান কোরিয়ার ব্যাপার লইয়া চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে চীন জাপানের হস্তে পরাজিত হয়। জাপান যাহা আশা করিয়াছিল তাহা সে লাভ করিল। যুদ্ধ জয়ের ফলে তাহার সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল এবং ইউরোপীয়দের সহিত যে সকল অপমান জনক সন্ধি করিতে পূর্ব্বে সে বাধ্য হইয়াছিল ঐ সকল সন্ধির সর্ত্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

ইহার পর রাশিয়া চীনের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া মাঞ্চুরিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইল এবং পোর্ট আর্থারেব ভিতরে রেলপথ তৈরী করিয়া মস্কোর সহিত সংযোগ স্থাপন করিল। মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ার স্থায়ী ভাবে অবস্থান জাপানের পক্ষে বিপদজনক হইয়া পড়িল। সুতরাং জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই যুদ্ধে পাশ্চাত্য রণ নীতিতে নূতন দীক্ষা প্রাপ্ত জাপান অদ্ভুত রণকৌশলের পরিচয় দিল। রুশ সৈন্য-বাহিনী ভীষণভাবে পরাজিত হইল। পোর্ট আর্থারে অবস্থিত রুশ

নৌবাহিনী জাপানের এডমিরাল টোগোর নিকট আত্মসমর্পণ করিল এবং পোর্ট আর্থারে আসিবার পথে আর একটি রুশ নৌবাহিনী এডমিরাল টোগোর হস্তে বিধ্বস্ত হইল। জাপান যুদ্ধে জয়ী হইল। মাঞ্চুরিয়াতে তাহার আধিপত্য স্থাপিত হইল।

এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জাপান প্রাচ্যে সাম্রাজ্যকামী পাশ্চাত্য শক্তিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। তাহার সাম্রাজ্য লিপ্সা নগ্ন ভাবে দেখা দিল। পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে সে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সুযোগ লইয়া জাপান চীনের উপর তাহার প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য একুশ দফা দাবি করিয়া চীনের নিকট এক চরম পত্র পাঠাইল এবং চীনকে উহার অনেকগুলি দাবিই পূরণ করিতে বাধ্য করিল। চীন জাপানকে মাঞ্চুরিয়া ছাড়িয়া দিল এবং কোন কোন বিষয়ে জাপানের কর্ত্তৃত্ব মানিয়া লইল। ফলে জাপান এশিয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইল। ইহা ছাড়া জাপান চীনে জার্ম্মান অধিকৃত কিয়োচাও হস্তগত করিল এবং সুনটাং প্রদেশ অধিকার করিয়া লইল। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইলে ভার্সাইর সন্ধিতে সে ঐ দুইটি স্থানই লাভ করিল। কিন্তু ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ওয়াশিংটনের কনফারেন্স চীনে তাহার সাম্রাজ্য বিস্তারের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করিল। ঐ কনফারেন্সের চাপে পড়িয়া জাপানকে কিয়োচাও ও সুনটাং প্রত্যর্পণ করিয়া এক সন্ধি করিতে হইল।

ইহার পর জাপান কিছুদিন চুপ করিয়া থাকিয়া ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে চীনে অধিকার বিস্তার

করিতে লাগিল একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। চীনের সহিত জাপানের এই যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। কিন্তু জাপানের এই অকারণ আক্রমণে চীনের জনগণ আত্মরক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হইল এবং তাহার চীন জয়ের চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ করিয়া দিল।

অনুশীলনী

১। বর্ত্তমান যুগের চীন ও জাপানের ইতিহাসের তুলনা কর।

২। অহিফেনের যুদ্ধ কাহাকে বলে? চীনের নিকট হইতে পাশ্চাত্য জাতিগুলি কি করিয়া সুবিধা আদায় করিয়া লইয়াছিল?

৩। চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ কি? ইহার ফল কি হইয়াছিল?

৪। সান ইয়াট সেন কে ছিলেন? তিনি চীনের জন্য কি করিয়াছিলেন?

৫। কোন্ কোন্ শত্রুর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক চীনকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল?

৬। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চীন কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল? তাহার ফল কি হইয়াছিল?

৭। দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধের ফল কি হইয়াছিল?

৮। পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে জাপানের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

৯। পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আসিবার পর জাপানে কি কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল? তাহার কি ফল হইয়াছিল?

১০। রুশ-জাপান যুদ্ধ সম্বন্ধে কি জান?

১১। জাপানের সাম্রাজ্যবাদের পরিচয় কোন্ কোন্ ঘটনা হইতে পাওয়া যায়?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাশিয়ার বিপ্লব ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র

বর্ত্তমান শতাব্দীতে রাশিয়ার বিপ্লব ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লবের মতই রাশিয়ার বিপ্লব মানব সভ্যতার গতিকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। জার্ম্মান মনীষী কার্ল মার্ক্স যে মতবাদ প্রচার করেন তাহা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপে প্রচলিত হয়। রাশিয়ার বিপ্লব মার্ক্সের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছে।


কার্ল মার্ক্স

কার্ল মার্ক্স তাঁহার মতবাদ কমিউনিষ্ট ইস্তাহার বা ম্যানিফেষ্টো নামে একখানি পুস্তকে প্রথম প্রকাশ করেন। তাঁহার মতবাদের জন্য তিনি নির্ব্বাসিত হইয়া ইংলণ্ডে আসিয়া বাস করেন। তখন শিল্প বিপ্লবের যুগ চলিতেছিল। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে তিনি জাতীয় অর্থনীতির সমালোচনা এবং ধনতন্ত্রের মর্ম্মবাণী নামে দুইখানি গ্রন্থ

প্রকাশ করেন। বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টি লইয়া মানবসমাজের পরিণতি সম্বন্ধে মার্ক্স ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন যে এমন একদিন আসিবে যখন শ্রমিকেরাই শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। তখন সমাজ ও গভর্ণমেণ্ট তাহারাই পরিচালিত করিবে। আর্থিক ভিত্তিতে গঠিত বর্ত্তমান সমাজ, যে সমাজে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিরাই প্রবল, সে সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং শ্রমিকেরা নূতন সমাজ গড়িবে। এই নূতন সমাজে ধনী বলিয়া কেহ থাকিবে না, সমস্ত অর্থের অধিকারী হইবে সমগ্র সমাজ বা জনগণ।

উনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া ছিল ইউরোপের একটি অনগ্রসর দেশ। রাশিয়ার রাজাকে বলা হইত 'জার'। জারের ছিল অপ্রতিহত ক্ষমতা। কিন্তু প্রকৃত শক্তিশালী ছিলেন জমিদারগণ। রাষ্ট্রের মধ্যে তাঁহাদেরই ছিল প্রাধান্য। সরকারী উচ্চপদগুলি তাঁহাদের দ্বারাই পূর্ণ করা হইত। এমন কি নৌ ও সৈন্য বিভাগের উচ্চপদগুলিতে তাঁহারাই নিযুক্ত হইতেন। এই সকল কর্ম্মচারীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সকল প্রকার পরিবর্ত্তনের বিরোধী। জার সৈন্য ও গোয়েন্দা পুলিশের সাহায্যে তাঁহারা ইচ্ছামত শাসন করিতেন।

রাশিয়ার বেশির ভাগ লোকই ছিল কৃষক। কৃষকদের মধ্যে আবার অধিকাংশই ছিল দরিদ্র ও নিরক্ষর। তাহাদের উপর জমিদারদের ছিল অবাধ কর্ত্তৃত্ব। জমিদারগণ কৃষকদিগকে প্রাণদণ্ড ছাড়া যে কোন প্রকার সাজা দিতে পারিতেন। জমিদারগণ জমির সঙ্গে কৃষকদেরও বিক্রয় করিতে পারিতেন।

রাশিয়ায় তখনও ভাল করিয়া শিল্প গড়িয়া ওঠে নাই। অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানই বিদেশী মূলধনের দ্বারা পরিচালিত হইত। রাশিয়ার কারখানাগুলির অবস্থা তখন ছিল অত্যন্ত খারাপ। শ্রমিকদের মজুরি

ছিল খুব কম এবং তাহাদের খাটাইয়া নেওয়া হইত অনেক বেশি সময়। তাহাদের এমন কঠিন পরিশ্রম করিতে হইত যাহাতে তাহাদের জীবন হইয়া উঠিত দুর্ব্বহ।

ইতিমধ্যে পাশ্চাত্যের নূতন নূতন রাজনৈতিক ভাবধারা রাশিয়ার শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকদের উপরে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। তাঁহারা জারের দায়ীত্বহীন ও পীড়নমূলক শাসনের পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য দেশগুলির অনুকরণে শাসন সংস্কারের দাবী করিতে লাগিলেন। নিহিলিষ্ট, সোসাল ডেমোক্র্যাটিক দল, সোসাল রিভোলিউশনারি দল প্রভৃতি অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হইল। লেনিনের নেতৃত্বে এইরূপ একটি দল গঠিত হইল। ইহার নাম হইল বলশেভিক দল। লেনিন বর্ত্তমান ইতিহাসের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁহার বিপ্লবী মতবাদের জন্য তাঁহাকে সাইবেরিয়াতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কারাগার হইতে পলাইয়া যান। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে বিদেশে কাটাইতে হইয়াছিল।

রাশিয়ার শেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাস অত্যন্ত অস্থির মতি ও দুর্ব্বল চিত্তের লোক ছিলেন। এই জন্য তাঁহার রাজত্বকালে অত্যাচার অসাধারণরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া কৃষকগণ বিদ্রোহ করিল। অবশেষে জার এক ঘোষণা দ্বারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি কতকগুলি অধিকার প্রদান করিলেন। রাশিয়ার লোকেরা কিছু রাজনৈতিক অধিকারও লাভ করিল।

কিন্তু ইহাদ্বারা নিকোলাসের বিপদ কাটিল না। শাসন কার্য্যেরও কোন উন্নতি হইল না। সুতরাং রাশিয়ায় জারের শাসনের পতন অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

অবশেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জারের স্বৈরাচারী শাসনের পতন ঘটিল। এই যুদ্ধে রাশিয়া জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি মিত্রশক্তির সহিত যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার মত সামরিক শক্তি রাশিয়ার ছিল না। ইহা ছাড়া শাসন পরিচালকদের অকর্ম্মণ্যতা ও দুর্নীতিতে যুদ্ধ পরিচালনায় অনেক ত্রুটী ঘটিতে লাগিল। রাশিয়া বার বার যুদ্ধে পরাজিত হইতে লাগিল। যুদ্ধের জন্য লোকের দুঃখ-দুর্গতি বাড়িয়া গেল। তাহারা স্বৈরাচার শাসনের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল। নানাস্থানে কৃষকদের দাঙ্গা, নগরে নগরে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট এবং সৈনিকদের সৈন্যবাহিনী পরিত্যাগ এক সঙ্কট অবস্থার সৃষ্টি করিল। ইহার উপর খাদ্যাভাব দেখা দিলে লোকের দুঃষ্ট-কষ্ট আরও ভীষণ হইল। শহরগুলিতে খাদ্যের জন্য দাঙ্গা হইতে লাগিল। সৈন্যগণ শৃঙ্খলা রক্ষা না করিয়া শ্রমিকদের সহিত যোগদান করিল। সৈনিক ও শ্রমিকদের এক সভা (সোভিয়েট) প্রতিষ্ঠিত হইল। একটি অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইল এবং জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইল।

কিন্তু অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ বন্ধ করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে, খাদ্য সরবরাহ করিতে এবং জমির পুনর্বণ্টন করিয়া দিতে অক্ষম হওয়ায় জনগণের অসন্তোষ দূর হইল না। তাহারা সর্বত্র সৈনিক ও শ্রমিকদের সভা (সোভিয়েট) স্থাপন করিল। স্থানীয় সোভিয়েটগুলি তাহাদের দাবী পূরণের জন্য আন্দোলন চালাইতে লাগিল।

ইহার পর সোভিয়েটের দুই দলের (মেনশেভিক ও বলশেভিক) মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল। বলশেভিকেরা জনগণের দাবি সমর্থন করিল এবং সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা পুরাতন অভিজাত শ্রেণীকে ধ্বংস করিয়া

শ্রমিকদের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সচেষ্ট হইল। লেনিন ও ট্রট্স্কি তাঁহাদের নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই দলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। এই সময় রাশিয়া প্রতি যুদ্ধেই পরাজিত হইল এবং তাহার জন্য অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টকেই দায়ী করা হইল। উহার খ্যাতি একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। ইতিমধ্যে বলশেভিকেরা তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া লয় এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেয়। লেনিনের এবং তাঁহার দুই সহকারী ট্রট্স্কি ও ষ্টালিনের নেতৃত্বে বলশেভিকেরা সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করিয়া লইল। ৭ই নভেম্বর এখনও রাশিয়ায় বিপ্লব দিবস বলিয়া পালন করা হয়।



লেনিন

বিপ্লবে সাফল্য লাভ করিয়া বলশেভিকরা জার্ম্মানীর সহিত সন্ধি করিয়া শান্তি স্থাপন করিল কারণ রাশিয়ার পুনর্গঠনের জন্য শান্তি ছিল একান্ত প্রয়োজন। বাহিরের শত্রুর সহিত শান্তি স্থাপন করিয়া লেনিন মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের আদর্শে রাশিয়াকে পুনর্গঠিত করিলেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ করা হইল এবং সকল জমি কৃষকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। কলকারখানাগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত ও শ্রমিকদের কাজ বাধ্যতামূলক করা হইল। তাহার পর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে

সোভিয়েট সংবিধান রচনা করিয়া নূতন রাষ্ট্র গঠন করা হইল। এই রাষ্ট্রের নাম দেওয়া হইল ইউনিয়ন অব সোসালিষ্ট সোভিয়েট রিপাব্লিক। সংক্ষেপে বলা হয় ইউ, এস, এস, আর।

সোভিয়েট রাষ্ট্র গঠিত হইলে তাহাকে বহু বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল। অভ্যন্তরে বিদ্রোহ, বাহির হইতে কয়েকটি বিদেশী শক্তির আক্রমণ, মহামারী এবং দুর্ভিক্ষ মিলিয়া নূতন রাষ্ট্রের অবস্থা অতি সঙ্কটজনক করিয়া তুলিল। অনেকে মনে করিল এ রাষ্ট্র স্থায়ী হইতে পারিবে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বলশেভিকরা সকল শত্রুকে দমন করিয়া তাহাদের রাষ্ট্রকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি মিত্ররাষ্ট্রগুলি রাশিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া প্রথমে স্বীকার করে নাই। তাহারা বলশেভিক রাশিয়াকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তাহারা রাশিয়া হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে বাধ্য হইল। পরে একটি একটি করিয়া তাহারা সকলেই শেষ পর্য্যন্ত রাশিয়ার নূতন রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লইল।


ট্রট্স্কি

এইরূপে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। রুশ বিপ্লবের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি হইতেছে

পুরাতন সমাজকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া এক নূতন সমাজ গঠন করার প্রচেষ্টা—যে সমাজে কোন প্রকার শ্রেণীবৈষম্য থাকিবে না, দরিদ্রের উপরে ধনীর অত্যাচার থাকিবে না। এই নূতন সমাজ গড়িবার জন্য সোভিয়েট সরকারকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে বহু পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইয়াছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ করিয়া জমি কৃষকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া এবং কলকারখানা রাষ্ট্রায়ত্তকরণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থলে ষ্টালিন নেতৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। রাশিয়ার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের জন্য ষ্টালিন একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করেন। এই পরিকল্পনার দ্বারা রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন করা হইল।



ষ্টালিন

পূর্ব্বে কৃষকরা ছোট ছোট জমিতে চাষ করিত। তাহাদের নিজ নিজ জমি আলাদা ভাবে চাষ করা বন্ধ করিতে বাধ্য করা হইল। ঐ সকল ছোট ছোট ক্ষেত একত্র করিয়া গ্রামের সমস্ত কৃষক সমবেত-ভাবে উন্নত ধরণের চাষের যন্ত্রপাতির সাহায্যে যাহাতে চাষ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইল। এইরূপ জমি চাষের ব্যবস্থাকে

সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করা বলে। জনগণের অবস্থার উন্নতির জন্য অবৈতনিক শিক্ষা ও বিনা খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল। শ্রমিক-গণ হইল কলকারখানার মালিক। এইগুলি পরিচালনার ভার লইল সোভিয়েট সরকার। এই পরিকল্পনার ফলে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ এবং কলকারখানাগুলির কাজ চলিতে লাগিল। বেকার সমস্যার সমাধান হইল। সকল লোককেই কাজ দেওয়া হইল। দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইল। জারের আমলে যে রাশিয়া অতিশয় অনগ্রসর



সুপ্রীম সোভিয়েট

ও দরিদ্র দেশ ছিল এইরূপে তাহা এখন একটি বিরাট সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হইল।

ইউ, এস, এস, আর বা ইউনিয়ন অব সোসালিষ্ট সোভিয়েট রিপাবলিক কতকগুলি সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র লইয়া গঠিত হইয়াছে।

প্রত্যেকটি রাষ্ট্র শাসন ব্যাপারে স্বাধীন হইলেও উহার প্রত্যেকটিই যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গ। মধ্য এশিয়ায় এইরূপ কতকগুলি অঙ্গরাষ্ট্র আছে। একেকটি রাষ্ট্রে একেক জাতির লোক বাস করে। উহারা আকৃতিতে এবং পোষাক পরিচ্ছদে একে অপর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনটি অঙ্গরাষ্ট্র—উজবেক, তুর্কমেন এবং কাজাকের লোকদের ছবি দেখিলেই



উজবেক

ইহা বুঝিতে পারিবে। প্রত্যেক নগর ও প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া



কাজাক



তুর্কমেন

সোভিয়েট বা শ্রমিক সভা আছে। ইহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি


সোভিয়েট রাশিয়া
মাইল
১০০ ২০০ ৪০০ ৬০০
উত্তর মহাসাগর
আর্কেঞ্জেল
লেনিনগ্রাদ
মস্কো
কিয়েভ
ওডেসা
রস্টোভ
স্ট্যালিনগ্রাদ
বাটুম
বাকু
বোখারা
ক্রাসনোভস্ক
তাসকন্দ
সমরকন্দ
ওমস্ক
ট্রান্স সাইবেরীয় রেলপথ
নোবোসিবিরস্ক
ইয়াকুটস্ক
লেনা নং
চিটা
ইর্কুটস্ক
আমুর নং
নিকোলায়েভস্ক
ভ্লাডিভস্টক
মঙ্গোলিয়া
চীন সাধারণতন্ত্র
তুরস্ক
ইরাক
ইরান
আরব
আফগানিস্তান
পাকিস্তান
ভারত

লইয়া অল রাশিয়ান কংগ্রেস অব সোভিয়েট্স বা নিখিল রাশিয়ার সোভিয়েট কংগ্রেস গঠিত হয়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ইহাই হইল সর্ব্বোচ্চ সরকার বা গবর্ণমেণ্ট। কিন্তু সকলের উপরে হইল কমিউনিষ্ট দল। সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা একমাত্র এই দলেরই আছে।

জারের আমলে রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে বাস করিত কতকগুলি পরাধীন ও অত্যাচারিত জাতি। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এখন উহাদের লইয়া গঠিত হইয়াছে কতকগুলি স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র।

অনুশীলনী

১। কার্ল মার্ক্স কে ছিলেন? তাঁহার বিষয় কি জান?

২। উনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার অবস্থা কিরূপ ছিল?

৩। রুশ বিপ্লবের কারণ বর্ণনা কর।

৪। জার নিকোলাসের বিষয় কি জান?

৫। লেনিন, ট্রট্স্কি ও ষ্টালিন সম্বন্ধে কি জান?

৬। ষ্টালিনের পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে রাশিয়ার কি উন্নতি হইয়াছিল?

৭। রাশিয়ার বর্ত্তমান নাম কি? কেন ঐ নাম দেওয়া হইয়াছে? বলশেভিক বলা হয় কাহাদের?

৮। বর্ত্তমান রাশিয়ার শাসন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

দুইটি বিশ্বযুদ্ধ, লীগ অব নেশনস্ ও ইউ, এন, ও

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ হয়। এই দুইটি মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর মানুষকে অত্যন্ত দুঃখ ও কষ্টে পড়িতে হয় এবং মানব ইতিহাসের ধারা গভীরভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। দুইটি যুদ্ধই আরম্ভ করে জার্ম্মানী, যদিও ইহার জন্য তাহাকেই কেবলমাত্র দোষী করা যায় না। দুইটি যুদ্ধের প্রধান কারণ হইল জার্ম্মানীর উগ্র স্বদেশানুরাগ ও বাণিজ্য এবং উপনিবেশ লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

বিস্মার্কের সময় প্রুশিয়ার নেতৃত্বে জার্ম্মানীর রাষ্ট্রগুলির একীকরণ ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়ের গৌরব লাভ করিবার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহার পর জার্ম্মানী কি করিয়া ইউরোপের মধ্যে একটি বৃহৎ দুর্দ্ধর্ষ শক্তিতে পরিণত হইল এবং কি করিয়া অন্যান্য ইউরোপীয় রাজ্যগুলির সহিত তাহার বিবাদ বাধিতে লাগিল এইবারে তাহা বলিব। কারণ ইহা না জানিলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কি করিয়া অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিবে না।

এই সময় জার্ম্মানী বিজ্ঞান ও শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। বিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে বড় বড় শিল্প গড়িয়া ওঠে। সামরিক শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া ছিল প্রুশিয়ার বহু কালের ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্যকে পুনরায় জাগাইয়া তোলা হইল। জার্ম্মানদিগকে

সমরাভিলাষী করিয়া তুলিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। নৌ ও সৈন্যবাহিনী বিপুল আকারে বৃদ্ধি করা হইল। জার্ম্মান জাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—মানব জাতির নেতৃত্ব করিবার জন্যই তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছে—এই বিশ্বাস এবং উগ্র স্বদেশানুরাগ তাহাদের মনে জাগরিত করা হইল। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার সাধন করিয়া জার্ম্মানীকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিলেন। তাঁহার আক্রমণাত্মক বৈদেশিক নীতি ও উপনিবেশ বিস্তারের দ্বারা তিনি জার্ম্মানীকে বিশ্বের প্রধান শক্তিতে পরিণত করিতে চাহিলেন। তাঁহার উগ্র নেতৃত্বে জার্ম্মানগণ বিশ্বশক্তি স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।



কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম্

জার্ম্মানী আর একটি কাজ করিল যাহাতে ইউরোপ ক্রমে ক্রমে দুইটি শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িল। সে অষ্ট্রিয়া ও ইটালীর সহিত আত্মরক্ষামূলক সন্ধি করিল। এই সন্ধি ইতিহাসে ত্রিশক্তির সন্ধি নামে খ্যাত। এই সন্ধির প্রত্যুত্তরে ফ্রান্স রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া সন্ধি করিল। কিছুকাল পরে ইংলণ্ড এই দুই শক্তির সহিত যোগ দিয়া মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপন করিল। ইহাকে বলা হইল আঁতাত কর্ডিয়াল বা আন্তরিক মৈত্রী সম্বন্ধ।

ইহার পরে নানা বিষয় লইয়া ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল। নৌশক্তিতে, উপনিবেশ স্থাপনে এবং বাণিজ্য বিস্তারে জার্ম্মানী ইংলণ্ডের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিলে, ইংলণ্ড ভীত হইয়া পড়িল। ফ্রান্স জার্ম্মানীর নিকট শোচনীয় পরাজয়ের কথা ভুলিতে পারে নাই। রাইন নদীর তীরবর্ত্তী অঞ্চল হারাইয়া সে উহার উদ্ধারের সুযোগ খুঁজিতেছিল। জার্ম্মানীর পুনরাক্রমণের ভয়ও তাহার ছিল। ইউরোপের পূর্ব্বাঞ্চলে তুরস্কের উপর জার্ম্মানী তাহার প্রভাব প্রতিষ্ঠা করায় এবং অষ্ট্রিয়া বল্কান প্রদেশে তাহার অধিকার বিস্তার করায় রাশিয়ার স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছিল।

ইউরোপের প্রধান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও ভীতি এমন অবস্থার সৃষ্টি করিল যে প্রত্যেকেই তাহার সমরশক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিল। নৌ-সৈন্য ও স্থল-সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য উহাদের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। প্রত্যেকেই আশঙ্কা করিল যুদ্ধ অনিবার্য্যভাবেই আসিবে।

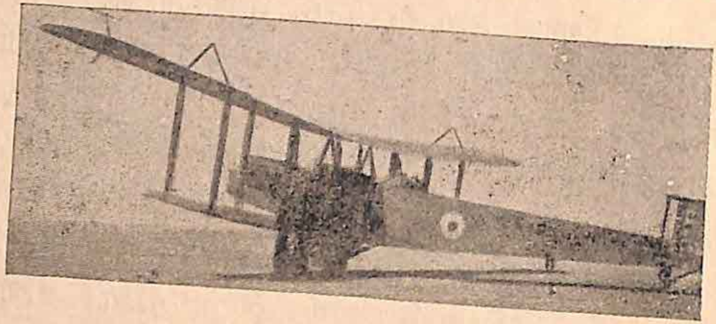
১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ সত্য সত্যই আসিল। ঐ বৎসর ২৮শে জুন অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী ফ্রান্সিস ফার্ডিনাণ্ডকে বোসনিয়ার রাজধানী সিরাজিভো নগরে হত্যা করা হয়। এই ঘটনাটি হইতেই ইউরোপে সমরানল জ্বলিয়া ওঠে।

অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে বহু সার্বিয়ান বাস করিত। ইহারা ছিল শ্লাভ জাতি। সার্বিয়া তাহার নেতৃত্বে শ্লাভদিগকে একত্র করিয়া একটি শ্লাভ রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা করিয়াছিল। ঐরূপ একটি রাজ্য গঠন করিলে অষ্ট্রিয়ার সার্বিয়ানরা ঐ রাজ্যে চলিয়া যাইবে। তাহাতে অষ্ট্রিয়ার দারুণ ক্ষতি হইবে। সুতরাং ঐরূপ একটি রাজ্য যাহাতে গঠিত

হইতে না পারে তাহার জন্য অষ্ট্রিয়া সকল প্রকার চেষ্টা করিতেছিল। ইহা লইয়া অষ্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে বিবাদও চলিতেছিল। রাজকুমার ফ্রান্সিসকে হত্যা করা হইলে অষ্ট্রিয়া সার্বিয়াকেই দায়ী করিল এবং সার্বিয়ার নিকট অতিশয় অপমানকর কতকগুলি দাবি করিয়া এক চরমপত্র পাঠাইল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঐ সকল সর্ত্ত গ্রহণ করিয়া উত্তর দিতে বলা হইল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর না পাইলে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে বলিয়া জানাইয়া দেওয়া হইল। সার্বিয়া ঐ সকল সর্ত্ত গ্রহণ করিতে অসম্মত হইল। অষ্ট্রিয়া কিছুমাত্র সময় না দিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়ার সহিত যোগ দিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া সম্মিলিতভাবে জার্ম্মানীকে বাধা দিবার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এই ভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং চারিবৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে থাকে। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান শক্তিগুলিই এই যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মানীর সহিত যোগ দিয়াছিল তুরস্ক। কারণ রাশিয়ার সহিত তাহার বহুকালের শত্রুতা ছিল। বুলগেরিয়াও ইহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া এই ত্রিশক্তিকে বলা হইত মিত্র শক্তি। ইহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া যুদ্ধে ক্রমে ক্রমে যোগ দিয়াছিল ইটালী, জাপান, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, গ্রীস, চীন এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রুশ বিপ্লবের পর রাশিয়া যুদ্ধ হইতে সরিয়া পড়ে।

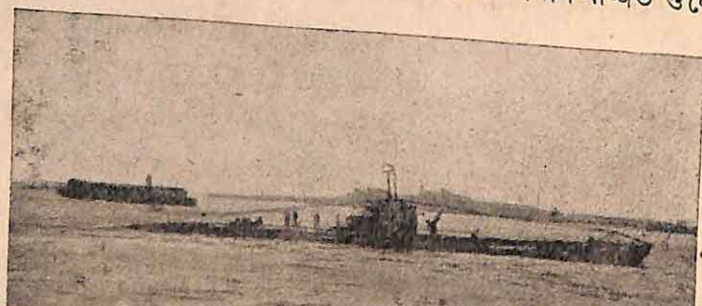
অতীতের সমস্ত যুদ্ধ হইতে এই যুদ্ধটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারণ এই যুদ্ধে প্রায় সমগ্র পৃথিবী জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে ইহাকে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর করিয়া তোলা হইয়াছিল। এই যুদ্ধে নূতন নূতন রণকৌশল অবলম্বন করা হয় এবং

নূতন ধরণের যানবাহন ও মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই যুদ্ধে কাঁটাতারে ঘেরা দীর্ঘ ও গভীর খাতের ভিতর হইতে সৈন্যদল যুদ্ধ



প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এরোপ্লেন

করিয়াছে, ভারী কামানের গোলায় ও এরোপ্লেন হইতে নিক্ষিপ্ত বোমার বিস্ফোরণে বহু জনপদ ধ্বংস করা হইয়াছে ; বৃহৎ কামান সজ্জিত ও লৌহ



ইউ-বোট

বর্মাবৃত ট্যাঙ্ক কাঁটাতারের বাধা, খাত ও পাহাড় অতিক্রম করিয়া দুর্গম পথে সৈন্য লইয়া ছুটিয়াছে ; বিষাক্ত বাষ্প ছড়াইয়া শত্রু সৈন্যদের শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছে এবং সাবমেরিন বা ইউ-বোট হইতে

টরপেডো ছুঁড়িয়া বড় বড় জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। সাবমেরিন জলের নীচু দিয়া চলে কিন্তু প্রয়োজন মত ভাসিয়া উঠিতে পারে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি এ যুদ্ধের মত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অতীতে আর হয় নাই। ইহা মানবজাতির কি ভীষণ ক্ষতি করিয়াছিল তাহা জানিতে পারিলে কেন এ কথা বলিয়াছি তাহা বুঝিতে পারিবে।

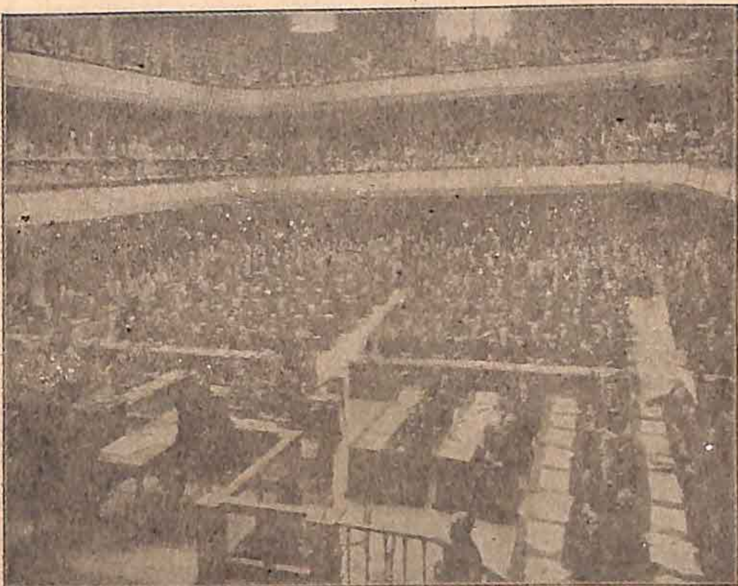
এই যুদ্ধে মিত্র শক্তির ৪০,০০০,০০০ এবং জার্ম্মানীর ২০,০০০,০০০ সৈন্য, মোট ৬ কোটি সৈন্য যুদ্ধ করিয়াছিল; তাহার মধ্যে ৯০ লক্ষ সৈন্য নিহত এবং ২০ লক্ষ সৈন্য আহত হইয়াছিল। যাহারা হতাহত হইয়াছিল তাহারা সকলেই ছিল মানব সমাজের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা, শক্তিমান, সাহসী ও কর্ম্মঠ যুবক। ইহা ছাড়া লক্ষ লক্ষ বেসামরিক পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু অনাহারে, রোগে, বোমা বিস্ফোরণে এবং গোলাগুলিতে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল।

যুদ্ধের খরচ মিটাইবার জন্য প্রত্যেক দেশকেই অসম্ভব রকমের ঋণ করিতে হইয়াছিল। বহু সম্পত্তি ধ্বংস হইয়াছিল। সকল দেশেরই বাণিজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। দ্রব্য মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসাধারণকে অপরিসীম দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল।

যুদ্ধের শেষের দিকে মিত্রশক্তিগুলি উন্নত ধরণের সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা এবং সর্ব্বত্র সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ পরিচালনা দ্বারা এত শক্তিশালী হইয়া উঠিল যে জার্ম্মানী ও তাহার বন্ধুরাষ্ট্রগুলি বার বার যুদ্ধে পরাজিত হইল। বুলগেরিয়া, তুরস্ক এবং অষ্ট্রিয়া মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করিল। শেষ পর্য্যন্ত জার্ম্মানীর এত ক্ষতি হইল যে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইবার সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র তাহার আর থাকিলই না। তখন সে শান্তি স্থাপন করিতে চাহিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর

কতকগুলি সর্ত্ত জার্ম্মানী মানিয়া লইলে যুদ্ধ বিরতির জন্য এক সন্ধি হইল। এইরূপে এই ভয়ঙ্কর বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইল। ১১ই নভেম্বরকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য আজও ঐ তারিখটি যুদ্ধ অবসানের দিন বলিয়া প্রতিপালিত হয়। বহু সভা, বহু বিচার ও পরামর্শের পর ভার্সাইর সন্ধি দ্বারা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইল। এই সন্ধিতে প্রত্যেক জাতিরই তাহার নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র থাকিবে এই নীতি গ্রহণ করা হয়। তদনুসারে অতীতের পরাধীন জাতিগুলি স্বাধীনতা লাভ করিল এবং অনেকগুলি নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল। ইউরোপের মানচিত্র নূতন করিয়া অঙ্কিত হইল। অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া রাজ্য গড়িয়া উঠিল। যে সকল জাতি লইয়া নূতন রাজ্যগুলির সৃষ্টি করা হইল উহারা সকলেই ছিল অষ্ট্রিয়ার অধীন। কিন্তু এই সন্ধিতে যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহাতে এই নীতি সর্ব্বক্ষেত্রেই মানিয়া লওয়া হয় নাই। যেমন প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়া নূতন রাজ্য হইলেও উহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া হইল না। প্রথমটি হইল বৃটিশ আশ্রিত, দ্বিতীয়টি হইল ফরাসী আশ্রিত। জার্ম্মানীকে বহু স্থান হারাইতে হইয়াছিল। তাহার উপনিবেশগুলি ছাড়িয়া দিতে হইল। যুদ্ধে সে বেসামরিক অধিবাসীদের যে ক্ষতি সাধন করিয়াছিল তাহার জন্য বিরাট ক্ষতি-পূরণের বোঝা তাহার স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হইল। ভার্সাইর সন্ধিতে জার্ম্মানীর উপর যে চরম কঠোর ব্যবস্থা করা হইল তাহার ফলে জার্ম্মানীর অধিবাসীদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। তাহারা ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইহাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি কারণ বলিয়া গণ্য করা হয়।

ভার্সাই সন্ধির সর্ত্তগুলি ঠিক করা হয় প্যারি নগরীর শান্তি-সম্মেলনে। এই সম্মেলনে লীগ অব নেশনস্ নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসন। ভবিষ্যতে পৃথিবীতে যুদ্ধ নিবারণ ও বিভিন্ন জাতির



লীগ অব নেশনস্

মধ্যে পারস্পরিক মতৈক্য ও সহযোগিতা দ্বারা শান্তি রক্ষা করা ছিল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রথম ২৪টি রাষ্ট্র লইয়া আরম্ভ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানে মোট ৬০টি রাষ্ট্র যোগদান করিয়াছিল। আমেরিকা ইহাতে যোগ দেয় নাই। বিজয়ী মিত্ররাষ্ট্র ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি প্রথম ইহার সভ্য হয়। পরে পরাজিত রাষ্ট্রগুলিকেও সভ্য করা

হইয়াছিল। জাপান ও ইটালী ইহাতে যোগ দিয়াছিল, কিন্তু পরে উহারা এ প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করে।

লীগ অব নেশনস্‌ের সদর দপ্তর নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা নগরে স্থাপিত হইল। হল্যাণ্ডের হেগ নগরে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ বাধিলে তাহার বিচারের জন্য বিশ্ব-আদালত বা আন্তর্জ্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা হইল।

লীগ অব নেশনস্ প্রথমে আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্বলাভ করিয়াছিল এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবাদ মিটাইবার চেষ্টাও করিয়াছিল কিন্তু প্রধান শক্তিগুলি তাহাদের স্বার্থ ত্যাগে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির ক্ষমতা ক্রমে কমিয়া গেল। শেষ পর্য্যন্ত ইহা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাত হইতে সারা পৃথিবীকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইল না।



মুসোলিনী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে দেশের যে ভীষণ ক্ষতি হইয়াছিল এবং যে ভাবে ভার্সাইর সন্ধি করা হইয়াছিল তাহা ইউরোপে নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিল। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলির দুর্গত জনগণ তাহাদের দুঃখ দূর করিবার যে কোন উপায় সাগ্রহে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিল। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইটালীর দুর্দ্দশা দূর করিবার সঙ্কল্প লইয়া যিনি অগ্রসর হইলেন তাঁহার নাম মুসোলিনী। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি

একটি শক্তিশালী দল গঠন করিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহার দলের নাম হইল ফ্যাসিষ্ট দল। মুসোলিনী এই দলের সাহায্যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা হস্তগত করিয়া নিজেকে ইটালীর রাষ্ট্রনায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি আশাহত ও অবসাদগ্রস্ত জাতির মনে আত্মবিশ্বাস আনিয়া দিয়াছিলেন এবং নূতন আশা জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, ইটালীকে আবার মর্য্যাদার আসনে বসাইয়াছিলেন। কিন্তু যে উপায়ে তিনি এই সকল কার্য্য করিয়াছিলেন তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত ইটালীর কল্যাণ না হইয়া ক্ষতিই হইয়াছিল। ফ্যাসিষ্টদের নীতি ছিল আক্রমণাত্মক। সুতরাং মুসোলিনী বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি জনমতের স্বাধীনতা দমন করিয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতের বিরুদ্ধতা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।


হিটলার

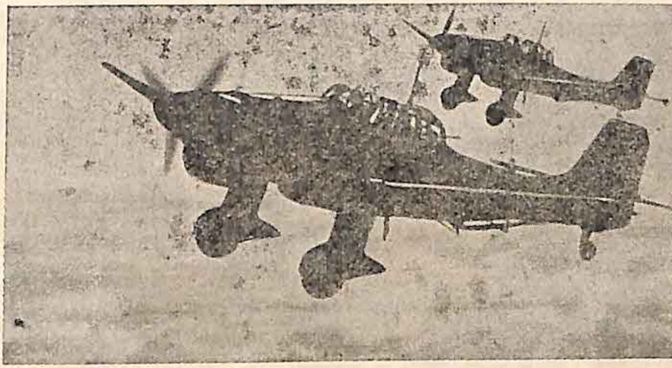
মুসোলিনীর ন্যায় জার্ম্মানীতে নাজি দলপতি হিটলারও রাষ্ট্রের ক্ষমতা অধিকার করিয়া লন। নাজি দল অনেক বিষয়েই ফ্যাসিষ্ট দলের অনুরূপ ছিল। ভার্সাই সন্ধির পর জার্ম্মানীর অবস্থাও অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়ে। মিত্রশক্তি তাহার নিকট ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে বিপুল অর্থ দাবি করে তাহা দেওয়া তাহার

পক্ষে অসম্ভব হইয়া ওঠে। হিটলার ক্ষমতা হস্তে লইয়াই যে ভার্সাইর সন্ধি জার্ম্মানীর দুর্গতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি ইটালী ও জাপানের সহিত এক সন্ধি করিলেন।

এশিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলে জাপানও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল না। সে চীন ও জাপানে ইউরোপীয়দের স্বার্থে আঘাত করিতে উদ্যত হইল এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

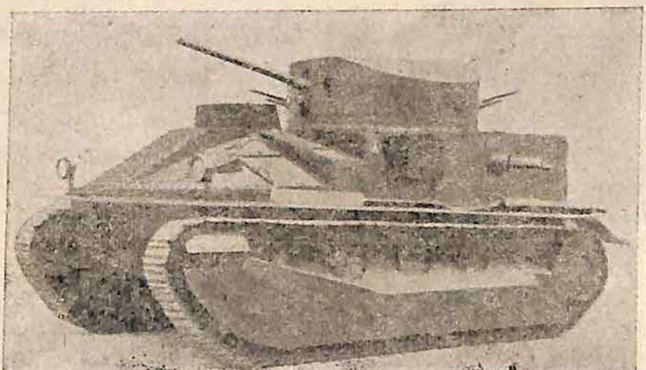
আপন শক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া হিটলার সৈন্য পাঠাইয়া অষ্ট্রিয়া হস্তগত করেন এবং উহা নাজি সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। প্রায় একই ভাবে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার কিছু অংশ গ্রাস করিয়া লন। তাহার পর রাশিয়ার সহিত একটি অনাক্রমণ চুক্তি করেন। ইংরাজই প্রথমে রাশিয়ার সহিত প্রথম সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিল কিন্তু রাশিয়া তাহা উপেক্ষা করিয়া জার্ম্মানীর সহিত সন্ধি করিয়া বসিল। কারণ রাশিয়া ইংরাজ ও ফরাসীদের বহু পূর্ব্ব হইতেই নাজিদের সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছিল কিন্তু তাহারা উহাতে কর্ণপাত করে নাই বলিয়া রাশিয়া উহাদের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল। স্বীয় শক্তিকে সর্ব্বপ্রকারে সুদৃঢ় করিয়া হিটলার ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন। এইরূপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ প্রথম যুদ্ধ হইতে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর ও ধ্বংসাত্মক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল এবং ইহা ৬ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। একপক্ষে ছিল জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপান (অক্ষ শক্তি) অপর পক্ষে ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা (মিত্রশক্তি)। আমেরিকা ও জাপান যোগ দিয়াছিল পরে—১৯৪১ খৃষ্টাব্দে। এই বৎসরই জার্ম্মানী রাশিয়া আক্রমণ করিলে রাশিয়া মিত্র পক্ষে যোগ দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ পোল্যাণ্ডে আরম্ভ হইয়া সমগ্র ইউরোপ, রাশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, পূর্ব্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে



দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এরোপ্লেন

ছড়াইয়া পড়ে। এই যুদ্ধকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি যান্ত্রিক যুদ্ধ বলা



জার্ম্মান বর্মাবৃত গাড়ী

চলে। এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক, বর্মাবৃত গাড়ী, টরপেডো ও সাবমেরিণ, দূর

পাল্লার বৃহদাকারের কামান ছিল এই যুদ্ধের প্রধান অঙ্গ। শত্রুসৈন্য



জার্ম্মান ট্যাঙ্ক



গ্যাস মুখোস পরা ট্রেঞ্চের ভিতর সৈনিকগণ

ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য বিষাক্ত গ্যাস নিক্ষেপ করা হইত। আবার

বিষাক্ত গ্যাস হইতে আত্মরক্ষার জন্য সৈন্যগণ গ্যাস মুখোস পরিয়া এবং লম্বা লম্বা খাত কাটিয়া তাহার ভিতর হইতে বন্দুকের সাহায্যে যুদ্ধ করিত। শত্রুর স্নায়ুকেন্দ্র গুলির উপর বোমা নিক্ষেপ করিতে ও খাদ্য ও সৈন্য দ্রুত সরবরাহ করিতে এরোপ্লেন ছিল প্রধান সহায়। এরোপ্লেন হইতে প্যারাসুটের সাহায্যে শত্রুর দেশে সৈন্য নামাইয়া গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করা হইত। এরোপ্লেন হইতে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করিয়া শত্রুর দেশের বড় বড় নগর কল-কারখানা, রেলের লাইন ও পোল ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইত। পার্ল হারবারে জাপানী এরোপ্লেন বোমা নিক্ষেপ করিয়া আমেরিকার ১০টি যুদ্ধ জাহাজ কয়েক মিনিটের মধ্যে ডুবাইয়া দেয়। যুদ্ধের শেষের দিকে আমেরিকা অ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করিয়া জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি নামে দুইটি নগর মুহূর্ত্তের মধ্যে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া ফেলে। কি ভীষণ এই অ্যাটম বোমা, ইহা হইতেই বুঝিতে পার।

জার্ম্মানী পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, বল্কান প্রদেশ প্রভৃতি ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশই অধিকার করিয়া লইয়াছিল এবং জাপান দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার থাইল্যাণ্ড, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (ইন্দোনেশিয়া), মালয়, এবং ব্রহ্মদেশ জয় করিয়াছিল। এই সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র জার্ম্মানী হইতে ব্রহ্মদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে জাপানীদের সহিত চুক্তি করিয়া আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করেন এবং সিঙ্গাপুরে প্রথম স্বাধীন ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে সসৈন্যে ভারতের পূর্ব্ব সীমানায় অবস্থিত ইম্ফল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানী রাশিয়া আক্রমণ করে। রাশিয়া ভীষণভাবে বাধা

দেয় এবং বহু যুদ্ধের পর জার্ম্মানীকে পরাজিত করে। ইহার পর রাশিয়া জার্ম্মানীকে আক্রমণ করিতে থাকে এবং জার্ম্মান অধিকৃত রাশিয়ার অঞ্চলগুলি পুনঃ অধিকার করিয়া লয়।

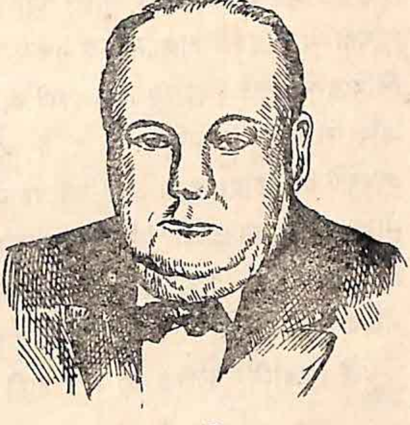
আফ্রিকাও যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। মিত্রশক্তি আফ্রিকার টিউনিশিয়া আক্রমণ করে এবং জার্ম্মানদের পরাজিত করিয়া আফ্রিকা হইতে উহাদের তাড়াইয়া দেয়। ইহার পর মিত্রশক্তি ইটালী আক্রমণ করে।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে পূর্ব্ব এশিয়াতে মিত্রশক্তির ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইতে আরম্ভ করে। প্রশান্ত মহাসাগরের বহু দ্বীপে জাপান ও মিত্রশক্তির মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই সকল যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু ক্ষতি হইলেও মিত্রশক্তি শেষ পর্য্যন্ত জয় লাভ করে। জাপান তড়িৎগতিতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলি জয় করিয়া লওয়ায় চীনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়া চীনে খাদ্যাদি পাঠান হইত। ব্রহ্মদেশ জাপানের হস্তগত হওয়ায় এই সরবরাহ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। মিত্রশক্তি হিমালয়ের উপর দিয়া এরোপ্লেনে চীনে সাহায্য পাঠাইতে লাগিল। আসামের জঙ্গলের মধ্য দিয়া ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত নূতন রাস্তা করিয়া ভারত হইতে ব্রহ্মদেশে জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার ব্যবস্থা করা হইল।

ইউরোপেও মিত্রশক্তির নিকট জার্ম্মানী পরাজিত হইতে লাগিল। অবশেষে মুসোলিনী ও হিটলারের মৃত্যু হইলে ইটালী ও জার্ম্মানী আত্মসমর্পণ করিল। জাপানও দুই দুইবার আমেরিকার সর্ব্বধ্বংসী বোমার পরিচয় পাইয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল।

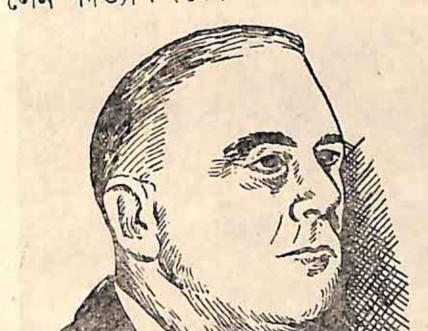
যাঁহাদের চেষ্টায় মিত্রশক্তি শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করিতে

পারিয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চহিল ও আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



চার্চ্চহিল

যুদ্ধের প্রথম দিকে হিটলারের বিরুদ্ধে ইংরাজগণ বিশেষ সুবিধা করিতে পারিল না। প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন ঠিকমত যুদ্ধ পরিচালনা করিতে পারিতেছেন না বলিয়া লোকেরা অভিযোগ করিতে লাগিল। এই কারণে চেম্বারলেন পদত্যাগ করেন এবং চার্চ্চহিল প্রধান মন্ত্রী হন। চার্চ্চহিল অসীম সাহস, আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতার সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করেন। রুজভেণ্ট প্রথমে ইংলণ্ড ও রাশিয়াকে আমেরিকা হইতে প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। অবশেষে প্রায় তিন বৎসর পর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং মিত্রশক্তির পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

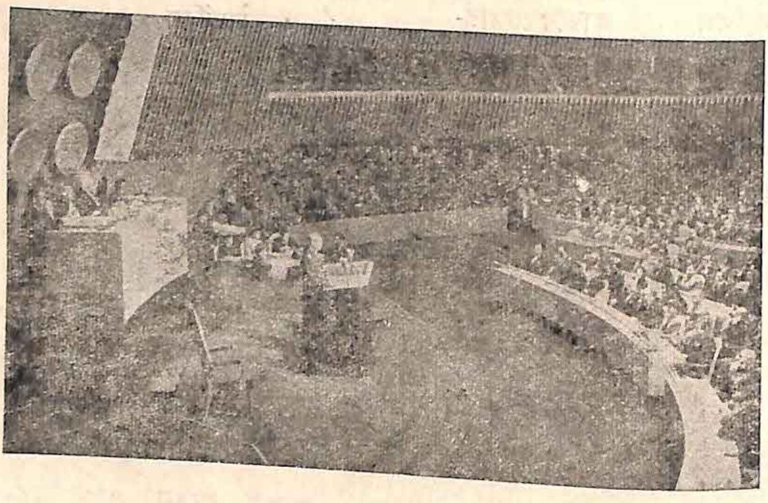


রুজভেণ্ট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইলে বিজয়ী মিত্রশক্তিগুলির মধ্যে

কোন কোন বিষয় লইয়া মতভেদ হয় এবং এই মতভেদের জন্য আজ পর্য্যন্তও পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইতে পারে নাই। সারা পৃথিবী আজ দুইটি রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া দুইটি শিবিরে পরিণত হইয়াছে। একটি রাশিয়ার নেতৃত্বে পূর্ব্বাঞ্চল গোষ্ঠী এবং অপরটি আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের নেতৃত্বে পশ্চিমী গোষ্ঠী। প্রথমটি রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের ফলে যে নূতন সমাজ ও শাসন-নীতি স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে তাহা দ্বারা প্রভাবান্বিত। আর দ্বিতীয়টি ইহার বিরোধী, কারণ তাহারা মনে করে যে এই নূতন সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি দ্বারা মানবের স্বাধীনতাই ধ্বংস করা হইবে।

এই বিরোধের মধ্যেও বহু রাষ্ট্র স্থায়ী শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে।



ইউ, এন, ও

বিশ্বে শান্তি স্থাপনের জন্য দ্বিতীয় যুদ্ধের শেষভাগে বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি মিলিয়া আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ বা 'লীগ অব নেশনস'এর পরিবর্ত্তে রাষ্ট্রসঙ্ঘ (ইউ,এন,ও)

নামে একটি সংস্থা গঠন করিয়াছে। অধিকাংশ শক্তিশালী রাষ্ট্রই ইহার সভ্য। রাষ্ট্র সঙ্ঘের মূলে রহিয়াছে একখানি গুরুত্বপূর্ণ সনদ। এই সনদে সর্ব্ব মানবের কতকগুলি অধিকারের কথা বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষ এই সঙ্ঘের একটি মুখ্য সভ্যপদ লাভ করিয়াছে এবং আন্তর্জ্জাতিক শান্তি রক্ষায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছে। 'লীগ অব নেশনস'এর অপেক্ষা রাষ্ট্র সঙ্ঘের অনেক বেশি কাজ করিবার ক্ষমতা আছে। ইহা কয়েকটি বিরোধের মীমাংসা করিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অন্যায় প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছে। রাষ্ট্র সঙ্ঘের বিভিন্ন বিষয়ের কার্য্য করিবার জন্য অনেকগুলি সংস্থা আছে। তাহাদের মধ্যে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফ, এ, ও), আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (আই, এল, ও), আন্তর্জ্জাতিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কৃষ্টি সম্বন্ধীয় সংস্থা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল সংস্থাগুলির ভিতর দিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে উন্নয়ন কার্য্য করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে।

অনুশীলনী

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মানীর অবস্থা কিরূপ ছিল ?

২। কি কি কারণে প্রথমে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। এই যুদ্ধের ফল কি হইয়াছিল ?

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কোন্ কোন্ শক্তি কোন্ কোন্ পক্ষে যোগ দিয়াছিল ? বিজ্ঞানের সাহায্যে এই যুদ্ধ কিরূপে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছিল ?

৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কতলোক নিহত হইয়াছিল ?

৫। যে সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয় তাহার নাম কি ? এই সন্ধিতে কি কি ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ?

৬। ফ্যাসিষ্ট ও নাজিদল সম্বন্ধে কি জান ?

৭। হিটলার ও মুসোলিনির বিষয় কি জান ?

৮। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ কি কি ? ইহা কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হইতেও ভয়ঙ্কর ছিল ?

৯। আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ কাহাকে বলে ? ইহার বিষয় কি জান ?

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভারতবর্ষ ও অপরাপর ঔপনিবেশিক দেশগুলির স্বাধীনতা অর্জ্জন এবং চীনের বিপ্লব।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় জাতিগুলি প্রায় সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার উপর তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করে। কোন কোন স্থান তাহারা হস্তগত করে যুদ্ধে জয় করিয়া, আবার কোন কোন স্থানের উপর নিজের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করে নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়া। বহুদিন বিদেশীদের পদানত থাকিবার পর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পরাধীন জাতিগুলি নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া ওঠে এবং বিদেশী শাসন পাশ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করে। এই মুক্তি সংগ্রামে যে সকল দেশ আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে ভারতের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতা লাভ বর্ত্তমান ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

প্রায় দুইশত বৎসর আমাদের দেশ ভারতবর্ষ ইংরাজ শাসনের অধীন ছিল। ইংরাজ রাজত্বের ফলে আমাদের গ্রামীন সভ্যতা ভাঙ্গিয়া পড়ে। এককালে এই গ্রামান সভ্যতাই ভারতকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। তখন লোকেরা গ্রামেই বাস করিত, গ্রামেই তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন করা হইত। ইংরাজদের শাসনাধীনে

আসিবার পর কিছু কিছু লোক তাহাদের প্রভাবে পড়িয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নূতন একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া তোলে। তাহারাই ভারতীয় প্রাচীন সমাজের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া তাহারা ক্রমে বুঝিতে পারে যে ইংরাজ শাসনাধীনে থাকিয়া দেশের উন্নতি সাধন করা সম্ভবপর নয়। যাঁহারা ইংরাজদের সৎ ইচ্ছা ও উদারনীতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন ক্রমে তাঁহারাও হতাশ হইলেন। তাঁহাদের মনের ক্ষুব্ধভাব পরে জাতীয় আন্দোলনরূপে প্রকাশ পাইল।

একটি ছোট ঘটনা লইয়া প্রথম জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। বাংলার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি আই, সি, এস পরীক্ষায় পাশ করার পর ইংরাজ সরকার তাঁহাকে কাজে নিযুক্ত করিতে অস্বীকার করে। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সকল উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীকেই আই, সি, এস পরীক্ষায় পাশ করিতে হইত। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি আদালতের আশ্রয় লইলে তাঁহাকে আই, সি, এসের পদে নিয়োগ করা হয় কিন্তু ইহার অল্প পরেই তাঁহাকে চাকুরী হইতে অপসারিত করা হয়। এইরূপে অপমানিত হইয়া



সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি

সুরেন্দ্রনাথ প্রথম জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করেন। জাতীয় আন্দোলনের প্রথম নায়ক সুরেন্দ্রনাথকে এইজন্য রাষ্ট্রগুরু বলা হয়। সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ভারতসভা (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন) স্থাপন করিয়া সারা ভারতে আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। ইহারই ফলে জনমত প্রকাশের এবং সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার একটি সর্ব্বভারতীয় সংস্থার প্রয়োজন বোধ করিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি হন বিশিষ্ট আইনজীবী (ব্যারিষ্টার) মিঃ ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জি। প্রথমে কংগ্রেস ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিল এবং কেবল সরকারের নীতির সমালোচনা ও রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু কংগ্রেসের দাবিতে সরকার বড় একটা কর্ণপাত করিত না। ফলে কংগ্রেস ক্রমেই ইংরাজ শাসনের বিরোধী হইয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রে, বঙ্গদেশে ও পাঞ্জাবে চরমপন্থী দলের সৃষ্টি হইল। চরমপন্থী



তিলক

দলের নেতারা কংগ্রেসের কেবলমাত্র প্রস্তাব পাশ করিয়া সরকারের নিকট আবেদন জানাইবার নীতির নিন্দা করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা চাহিলেন ভারতের জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগরিত করিয়া তুলিতে এবং দেশকে স্বাধীন করিতে। এই নূতন আন্দোলনের নেতা ছিলেন মহারাষ্ট্রে বাল গঙ্গাধর তিলক, বঙ্গদেশে বিপিন চন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ এবং পাঞ্জাবে লালা লাজপত রায়। সুরেন্দ্রনাথ, ফিরোজ শাহ মেটা এবং গোখেল তাঁহাদের নীতি সমর্থন করিতে পারিলেন না। ফলে কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরসপন্থী —এই দুই দলে বিভক্ত হইল।



অরবিন্দ

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বড় লাট লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। মাতৃভূমিকে বিভক্ত করায় সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মনে দারুণ আঘাত লাগে এবং তীব্র গণ আন্দোলন আরম্ভ হয়। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র এবং আব্দুল রসুল ও অরবিন্দের নেতৃত্বে এই আন্দোলন দাবাগ্নির মত সারা বঙ্গদেশে, এমন কি তাহার বাহিরেও ছড়াইয়া পড়ে। এই আন্দোলন চরমপন্থীদের শক্তিশালী করিয়া তুলিল। এই স্বদেশী আন্দোলন ভারতে জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। সারা বাংলার যুবক ও বৃদ্ধ স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জনের শপথ গ্রহণ করিল। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে বাংলার আকাশ বাতাস কাঁপিয়া উঠিল, বাংলার যুবকদের শিরায় শিরায় নূতন রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহাদের মনে দুর্দম সাহস আনিয়া দিল। সর্ব্বত্র বন্দেমাতরম্ ধ্বনি তুলিয়া মিছিল বাহির হইতে লাগিল। তাহারা হাসিমুখে পুলিশের নির্য্যাতন সহ্য করিল। সরকার কঠোর

সুরেন্দ্রনাথ প্রথম জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করেন। জাতীয় আন্দোলনের প্রথম নায়ক সুরেন্দ্রনাথকে এইজন্য রাষ্ট্রগুরু বলা হয়। সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ভারতসভা (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন) স্থাপন করিয়া সারা ভারতে আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। ইহারই ফলে জনমত প্রকাশের এবং সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার একটি সর্ব্বভারতীয় সংস্থার প্রয়োজন বোধ করিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি হন বিশিষ্ট আইনজীবী (ব্যারিষ্টার) মিঃ ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জি। প্রথমে কংগ্রেস ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিল এবং কেবল সরকারের নীতির সমালোচনা ও রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু কংগ্রেসের দাবিতে সরকার বড় একটা কর্ণপাত করিত না। ফলে কংগ্রেস ক্রমেই ইংরাজ শাসনের বিরোধী হইয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রে, বঙ্গদেশে ও পাঞ্জাবে চরমপন্থী দলের সৃষ্টি হইল। চরমপন্থী



তিলক

দলের নেতারা কংগ্রেসের কেবলমাত্র প্রস্তাব পাশ করিয়া সরকারের নিকট আবেদন জানাইবার নীতির নিন্দা করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা চাহিলেন ভারতের জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগরিত করিয়া তুলিতে এবং দেশকে স্বাধীন করিতে। এই নূতন আন্দোলনের নেতা ছিলেন মহারাষ্ট্রে বাল গঙ্গাধর তিলক, বঙ্গদেশে বিপিন চন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ এবং পাঞ্জাবে লালা লাজপত রায়। সুরেন্দ্রনাথ, ফিরোজ শাহ মেটা এবং গোখেল তাঁহাদের নীতি সমর্থন করিতে পারিলেন না। ফলে কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী —এই দুই দলে বিভক্ত হইল।



অরবিন্দ

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বড় লাট লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। মাতৃভূমিকে বিভক্ত করায় সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মনে দারুণ আঘাত লাগে এবং তীব্র গণ আন্দোলন আরম্ভ হয়। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র এবং আবদুল রসুল ও অরবিন্দের নেতৃত্বে এই আন্দোলন দাবাগ্নির মত সারা বঙ্গদেশে, এমন কি তাহার বাহিরেও ছড়াইয়া পড়ে। এই আন্দোলন চরমপন্থীদের শক্তিশালী করিয়া তুলিল। এই স্বদেশী আন্দোলন ভারতে জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। সারা বাংলার যুবক ও বৃদ্ধ স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জনের শপথ গ্রহণ করিল। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে বাংলার আকাশ বাতাস কাঁপিয়া উঠিল, বাংলার যুবকদের শিরায় শিরায় নূতন রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহাদের মনে দুর্দম সাহস আনিয়া দিল। সর্ব্বত্র বন্দেমাতরম্ ধ্বনি তুলিয়া মিছিল বাহির হইতে লাগিল। তাহারা হাসিমুখে পুলিশের নির্য্যাতন সহ্য করিল। সরকার কঠোর

দমন নীতি দ্বারা আন্দোলন বন্ধ করিতে তৎপর হইয়া উঠিল। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। আন্দোলন গুপ্ত পথে চলিতে লাগিল। বিপ্লবী দল গড়িয়া উঠিল। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে বোমা পিস্তল লইয়া আক্রমণ চলিতে লাগিল। কোন কোন রাজকর্ম্মচারী নিহত হইলেন। দ্বাদশ বর্ষের বালক ক্ষুদিরাম হাসিতে হাসিতে ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ দিল। অরবিন্দ ষড়যন্ত্রের অপরাধে বন্দী হইলেন। সরকারের দমননীতি ব্যর্থ হইল। বাঙ্গালীর আন্দোলন, বাংলার যুবকদের সাহসের নিকট সরকারকে হার মানিতে হইল। বঙ্গব্যবচ্ছেদের আদেশ রদ করা হইল। দুই বাংলা আবার এক হইল। (১৯১১ খৃষ্টাব্দ)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। সেই আকাঙ্ক্ষাকে যিনি বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছিলেন তাঁহার নাম মহাত্মা গান্ধী। তাঁহার কর্ম্ম-জীবন আরম্ভ হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। তথায় তিনি শ্বেতাঙ্গ জাতির অত্যাচার হইতে প্রবাসী ভারতীয়দের রক্ষা করিবার জন্য বহুদিন সংগ্রাম করিয়াছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি সরকারের অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার নূতন পথের সন্ধান দেন। তাঁহার নেতৃত্বে ভারতে নূতন আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনকে সত্যাগ্রহ বলা হয়। ইহার অর্থ হইতেছে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা। সত্যাগ্রহ ভারতবাসী হিংসার আশ্রয় না লইয়া শান্তিপূর্ণভাবে সাহসের সহিত অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে শিখাইল। মহাত্মা গান্ধীর নীতি কংগ্রেস গ্রহণ করিল। তিনি কংগ্রেসের আন্দোলনকে গণ আন্দোলনে পরিণত করিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতে স্বাধীনতা আনয়নের জন্য দুইটি অহিংস আন্দোলন পরিচালনা করেন—একটি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ও অপরটি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। সত্যাগ্রহ আন্দোলন আর একটি কারণে তীব্র আকার ধারণ করিল। বঙ্গব্যবচ্ছেদ রহিত হইবার পর মুসলমানগণ মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা স্থাপন করে। লীগ এ পর্য্যন্ত কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেয় নাই। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ইংরাজগণ তুরস্কের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া তাহার প্রতি যে ব্যবহার করে তাহাতে ভারতের মুসলমানগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে কারণ তুরস্কের সুলতান ছিলেন মুসলমানদের প্রধান ধর্ম্মগুরু বা খালিফা। এজন্য তাহারাও ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিল। ইহাকে খিলাফৎ আন্দোলন বলা হয়। মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় খিলাফৎ আন্দোলনকারীরা কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেয়। এই সময় মহাত্মা গান্ধী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি মনে করিলেন যে যদি দেশের সকল লোক সকল কাজে ইংরাজ সরকারের সহিত অসহযোগ করে তাহা হইলে উহা টিকিতে পারে না। সরকারকে অচল করিবার জন্য



গান্ধী

সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন—আপিস, আদালত, আইন সভা, বিদ্যালয় বয়কট করা ও অবাঞ্ছিত আইন অমান্য করা এবং কর না দেওয়ার আন্দোলন আরম্ভ হইল। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সারা ভারত আলোড়িত করিয়া তুলিল। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং বারদোলীতে আইন অমান্য করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু উত্তর প্রদেশে চৌরি-চৌরা গ্রামের লোকেরা অহিংস না থাকিয়া ২ জন পুলিশকে হত্যা করে এবং থানা দুইটি আগুন দিয়া পোড়াইয়া দেয়। মহাত্মা গান্ধী সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আবার আইন অমান্য আন্দোলন ভীষণ ভাবে আরম্ভ হয়। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং দণ্ডীতে লবণ আইন ভঙ্গ করিতে গেলেন। সরকার নিষ্ঠুর দমন নীতি দ্বারা এই আন্দোলন বন্ধ করিতে সক্ষম হইল। স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে লাঠি দ্বারা প্রহার করিয়া, নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি করিয়া এবং হাজার হাজার লোককে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করা হইল। ফলে আন্দোলন তখনকার মত থামিয়া গেল। কিন্তু এই নির্ম্মম অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যে সকল দেশপ্রেমিক ভারতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা ছোট ছোট গুপ্ত বিপ্লবীদল গড়িয়া তুলিলেন।

অসহযোগ আন্দোলন ইংরাজ জাতিকে ভীত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা শাসন কার্য্যের সংস্কার সাধন করিয়া ভারতীয়দের শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে ১৯০৯, ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে—তাহারা তিনবার ভারতীয় শাসন বিধানের সংস্কার সাধন করিল। কিন্তু ইহার কোনটিতেই ভারতবাসী সন্তুষ্ট হইতে পারিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভারতবাসীর মত না লইয়াই ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়ান হইল। কংগ্রেস দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিল যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে তাহারা কোন সাহায্য করিবে না। কিন্তু জার্ম্মানী যখন দেশের পর দেশ জয় করিতে লাগিল; তখন ভারতে একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করা হইলে কংগ্রেস ইংরাজদের সহিত সহযোগীতা করিবে বলিয়া প্রস্তাব করিল। কিন্তু সে প্রস্তাব যখন সরকার প্রত্যাখ্যান করিল তখন কংগ্রেস আবার মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আন্দোলন আরম্ভ করিল। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে আন্দোলন নূতন রূপ গ্রহণ করিল। কংগ্রেস এবার গণসংগ্রাম ঘোষণা করিল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া বন্দী করা হইল। নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হইলে ভারতের নানা স্থানে নানা ভাবে গণসংগ্রাম চলিতে লাগিল। কোথাও বা রেল লাইন তুলিয়া ফেলা হইল, কোথাও বা টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেওয়া হইল আবার কোথাও বা ষ্টেশন গৃহ পোড়াইয়া দেওয়া হইল। অমানুষিক অত্যাচারের দ্বারা সরকার এই গণ অভুত্থান দমন করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে জাপান অক্ষশক্তির সহিত যোগ দিয়া ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া লইল। সুভাষ চন্দ্র বসু পূর্ব্বেই ভারত হইতে পলায়ন করিয়া জার্ম্মানীতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি এই সময় ব্রহ্মদেশে চলিয়া আসেন। শত্রু-চক্ষু এড়াইয়া সমুদ্রের ভিতর দিয়া জার্ম্মানী হইতে ব্রহ্মদেশে আসিয়া উপস্থিত হওয়া সত্যই বিস্ময়কর। তিনি ব্রহ্মদেশে আসিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। এই সময় হইতে তিনি নেতাজী নামে অভিহিত হন। আজাদ হিন্দ ফোজ গঠন করিয়া তিনি সিঙ্গাপুরে স্বাধীন ভারতের জন্য একটি সরকার (গভর্ণমেণ্ট) স্থাপন করেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ

লইয়া ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে ইম্ফল পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। জাপানের পতন ঘটিলে আজাদ হিন্দ ফৌজ ইংরাজদের নিকট আত্মসমর্পণ করে।



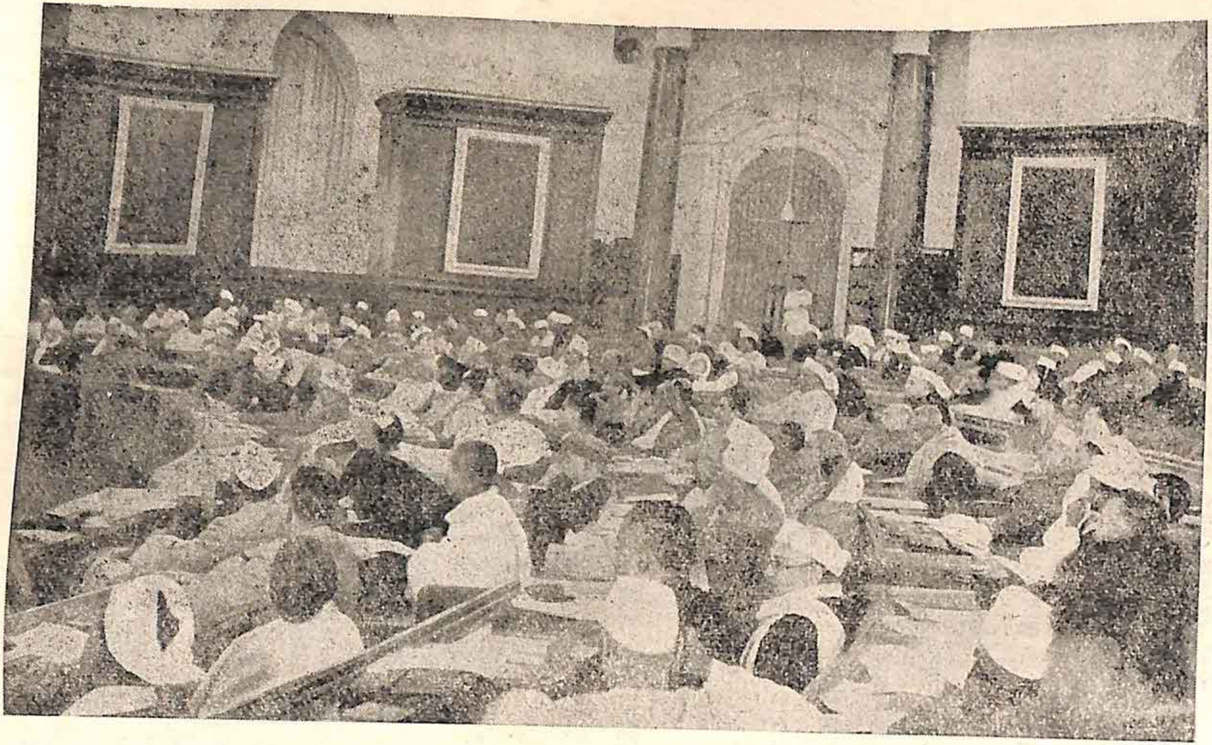
সুভাষচন্দ্র বসু

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে শ্রমিকদল ইংলণ্ডে ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং মন্ত্রী মণ্ডলী গঠন করে। নূতন প্রধান মন্ত্রী ভারতের অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য কয়েক জন মন্ত্রীকে নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিবার জন্য ভারতে প্রেরণ করেন।

তাঁহারা ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করিবার এবং বড়লাটের মন্ত্রীসভার পুনর্গঠন ও একটি গণ-পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করেন। মুসলীম লীগ এই প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া ১৬ই আগষ্ট ডাইরেক্ট অ্যাকসনের দিন ধার্য্য করেন। ঐ দিন কলিকাতায় মুসলমানগণ বহু হিন্দু হত্যা করিয়া তাহাদের ঘরবাড়ী পোড়াইয়া দেয়। হিন্দুরাও প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করে। ফলে কয়েকদিন ধরিয়া কলিকাতায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা চলিতে থাকে। প্রায় একমাস পর নোয়াখালিতেও মুসলমানরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সুসংবদ্ধ হইয়া হিন্দুদের আক্রমণ করে। এই সংবাদে বিহারের হিন্দুরা উত্তেজিত হইয়া তথাকার বহু মুসলমানকে হত্যা করিয়া নোয়াখালীর প্রতিশোধ লয়। ইহার পর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহাদের ভারত ছাড়িয়া যাইবার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পর মুসলীম লীগ পাঞ্জাবে 'ডাইরেক্ট অ্যাকসনে'র দিন ধার্য্য করেন। পাঞ্জাবে ব্যাপকভাবে হিন্দুদের হত্যা করা হয় এবং ঘরবাড়ী লুট করিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হয়। এই সকল ঘটনার পর হিন্দু ও শিখেরা ভারত বিভাগে স্বীকৃতি দান করে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারত বিভক্ত হয় এবং পাকিস্থানের সৃষ্টি হয়। ইহার দুই

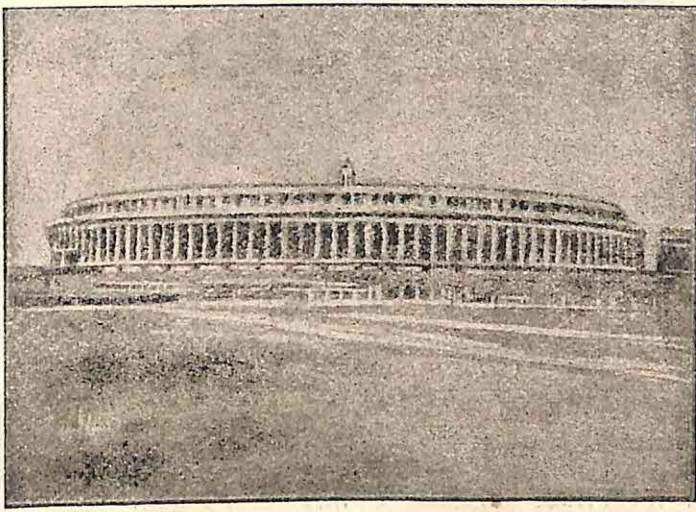


জহরলাল নেহেরু



ারতীয় পার্লামেন্টের অন্তর্দৃশ্য

বৎসর পর ভারতের গণ পরিষদ ভারতীয় সংবিধান রচনা করে ; ১৯৪৯ খৃস্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর উহা গৃহীত হয়। ভারতবর্ষ বৃটিশ সাধারণতন্ত্রের (কমনওয়েল্থ) অধীনে একটি গণতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে



ভারতীয় পার্লামেণ্ট (বর্হিদৃশ্য)

পরিণত হইল এবং গণপরিষদের নাম হইল ভারতীয় পার্লামেণ্ট। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ভারতের প্রধান মন্ত্রী হইলেন। তাঁহারই সুদক্ষ নেতৃত্বে ভারত আজ সমগ্র বিশ্বে সম্মানের আসন লাভ করিয়াছে এবং ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

পাকিস্থানের স্থষ্টিকর্ত্তা হইলেন মহম্মদ আলি জিন্না। তিনি ১৯২৯ খৃস্টাব্দে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া মুসলীম লীগে যোগ দেন এবং লীগের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া ওঠেন। তাঁহার নেতৃত্বে মুসলীম লীগ মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলি লইয়া স্বাধীন পাকিস্তান গঠনের দাবী করেন। এই দাবি

পূরণের উদ্দেশ্যেই মুসলীম লীগ ডাইরেক্ট অ্যাকসনের নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারই ফলে হিন্দু ও শিখগণ মিঃ জিন্নার দাবি মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। মিঃ জিন্না পাকিস্থানের প্রথম গবর্ণর জেনারেল হন।



জিন্না

ভারতে যখন মুক্তি সংগ্রাম চলিতেছিল তখন আরও অনেক দেশ ইউরোপীয়দের নাগপাশ ছিন্ন করিয়া নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছিল। পশ্চিম এশিয়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী আফ্রিকার দেশগুলিকে ইউরোপীয়গণ নাম দিয়েছে মধ্য-প্রাচ্য। ঐ সকল দেশে মুক্তি আন্দোলন অনেকটা সাফল্য লাভ করিয়াছে। সিরিয়া, ইরাক, লেবানন, জর্ডান প্রভৃতি দেশগুলি ইউরোপীয় প্রভুত্ব ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। পারস্য (বর্ত্তমান নাম ইরাণ) তৈলের (পেট্রল) খনির জন্য প্রসিদ্ধ। এই রাজ্যটী স্বাধীন হইলেও ইউরোপীয়গণ, বিশেষ করিয়া ইংরাজ ও আমেরিকানরা, উহার উপর নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পারস্যকে শোষণ করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। সর্দ্দার রিজা খান পারস্যের শাসন ক্ষমতা অধিকার

করিয়া পারস্যকে বিদেশী প্রভাব হইতে মুক্ত করেন এবং পারস্যের উন্নতির জন্য বহু সংস্কার সাধন করেন।

তুরস্ক পশ্চিম এশিয়ার একটী রাজ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ঐ রাজ্যটীর কোন কোন অংশ মিত্র শক্তিগুলি অধিকার করিয়া লয়। ১৯১৯ খৃস্টাব্দে মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে তুরস্কের নূতন জাতীয় দল গঠিত হয়। মুস্তাফা কামাল অকর্ম্মণ্য সুলতানকে সরাইয়া রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি হস্তগত করেন এবং মিত্রশক্তিগুলিকে তাহাদের সৈন্য অপসারণ করিতে বাধ্য করেন। ইহার পর তিনি তুরস্কে স্বাধীন গণতন্ত্র স্থাপন করেন এবং নিজে কামাল আতাতুর্ক নাম ধারণ করিয়া উহার প্রথম রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট হন। তাঁহার পরিচালনায় তুরস্ক একটী শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তিনি সাধারণতঃ কামাল পাশা নামে পরিচিত।

এশিয়া ও আফ্রিকার আরব অধ্যুষিত দেশগুলি ছিল তুরস্কের অধীনে। তাহারাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি দেশকে যেমন ইরাক, সিরিয়া ও জর্ডান, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয়গণ ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ঐ গুলির প্রত্যেকটীই এখন স্বাধীন হইয়াছে। মিশরও তুরস্কের অধীন ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বহু দিন ধরিয়া সে ছিল ইংলণ্ডের তাঁবেদার রাষ্ট্র। দীর্ঘকাল আন্দোলন করিবার পর এই সেদিন মিশরে বৃটীশ প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়াছে। মিশর পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান তীব্রগতিতে দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলি অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হইয়া ঐ সকল স্থান তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল। জাপানীরা

চলিয়া যাইবার পর বহু অস্ত্রশস্ত্র ঐ সকল দেশের অধিবাসীদের হস্তগত হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহারা কোন না কোন ইউরোপীয় জাতীর অধীন ছিল। অস্ত্র হাতে পাইয়া তাহারা স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধ করিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে একটী দেশ ছিল ইন্দোনেশিয়া—ডাচ্‌দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহারা স্বাধীন হইল। ভারতের মুক্তি অর্জ্জনের কিছু পরেই ব্রহ্মদেশ ও সিংহল দ্বীপ ইংরাজের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইল। ভারতের ন্যায় ঐ দুটী দেশও ইংরাজগণ ত্যাগ করিয়া গেল। ফরাসী ইন্দোচায়না এবং ইংরাজ অধিকৃত মালয়ে এখনও কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে মুক্তি সংগ্রাম চলিতেছে।

বর্ত্তমান কালের আর একটী বিশিষ্ট ঘটনা হইতেছে চীনে মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে পিপ্‌লস রিপাবলিক বা গণরাজ্য স্থাপন। জাপানের সহিত যুদ্ধের সময় চীনের কমিউনিষ্ট দল কুয়োমিনটাং দলের সহিত যোগদান করিয়াছিল। সান ইয়াট সেনের জাতীয় গণদলকে চীনা ভাষায় কুয়োমিনটাং বলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর জমিদার ও মহাজন পরিচালিত অকর্ম্মণ্য ও দুর্নীতি পরায়ণ কুয়োমিনটাং দলকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য কমিউনিষ্টগণ কুয়োমিনটাংএর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিল। চীনের কৃষকদের প্রতি কুয়োমিনটাংএর কোন সহানুভূতি ছিল না। তাহাদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ চীনের জনসংখ্যার বেশির ভাগই ছিল দরিদ্র কৃষক। সৌভাগ্যক্রমে কমিউনিষ্টগণ এই সময় মাও সে তুংকে নেতারূপে পাইয়াছিল। বাল্যকালেই কৃষকদের দুর্দ্দশা মাও সে তুংএর মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। যখন তিনি স্কুলের ছাত্র তখন হইতেই কৃষকদের দুরবস্থার কারণ—চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। তাহার পর বড় হইয়া তিনি গ্রামে

গ্রামে ঘুরিয়া কৃষকদের সঙ্গে বাস করেন এবং তাহাদের জাগ্রত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। চীনে কৃষকদের সংগঠিত আন্দোলন তিনিই আরম্ভ করেন এবং পরে কমিউনিষ্ট দলে যোগ দেন। তিনি কমিউনিষ্টদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী হইয়া ওঠেন। কুয়োমিনটাং সরকার অনেকবার তাঁহার মৃত্যু ঘোষণা করিয়াছিল কিন্তু প্রতিবারেই তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি বহু যুদ্ধ করিয়াছেন। একবার শত্রু হস্তে তিনি বন্দী হইয়াছিলেন কিন্তু শত্রু তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি পালাইয়া আসিয়াছিলেন।



মাও সে তুং

চীনে কুয়োমিনটাং ও কমিউনিষ্টদের মধ্যে যুদ্ধ বহুদিন ধরিয়া চলে। অবশেষে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে কমিউনিষ্টরা জয়ী হয় এবং ফরমোসা ছাড়া সমগ্র চীন কমিউনিষ্টদের অধিকারে আসে। কুয়োমিনটাং নেতা চিয়াং কাই শেক ফরমোসা দ্বীপে যাইয়া আশ্রয় লন এবং তথায় জাতীয়তাবাদী চীন রাজ্য স্থাপন করেন। চীনে স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী গণরাজ্য স্থাপিত হয়। এই নূতন চীনের রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ রাশিয়ারই



এশিয়া ও আফ্রিকার নব জাগরণ

যে সকল রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে

অনুরূপ। বর্ত্তমানে চীনের বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলির সর্ব্বাগ্রে সমাধানের চেষ্টা করা হইতেছে। মাও সে তুংএর নেতৃত্বে চীন বহু সমস্যার সমাধানে আশ্চর্য্য রকমের সফলতা লাভ করিয়াছে এবং দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

অনুশীলনী

১। কতদিন পর্য্যন্ত ভারত ইংরাজ শাসনের অধীন ছিল? ইংরাজ রাজত্বের ফল কি হইয়াছিল?

২। ভারতে প্রথম জাতীয় আন্দোলন কিরূপে আরম্ভ হয়? সুরেন্দ্র নাথকে রাষ্ট্রগুরু বলা হয় কেন?

৩। প্রথম কংগ্রেস অধিবেশন কবে হয়? উহার প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন কে? কংগ্রেসের উদ্দেশ্য কি ছিল?

৪। কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থীদলের সৃষ্টি হইয়াছিল কেন? চরমপন্থীদলের নেতাদের নাম কর?

৫। কে, কবে বঙ্গদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন? তাহার ফল কি হইয়াছিল?

৬। মহাত্মা গান্ধী কে ছিলেন? তাঁহার বিষয় কি জান?

৭। অহিংস অসহযোগ কাহাকে বলে?

৮। কোন বৎসর কংগ্রেস গণ-সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিল? ইংরাজ সরকার কিরূপে ইহা দমন করিয়াছিল?

৯। নেতাজী সুভাষ ও তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

১০। মহম্মদ আলি জিন্নার বিষয় কি জান? পাকিস্তান সৃষ্টি কি করিয়া হইল?

১১। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে কিরূপে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে? ভারতের প্রধান মন্ত্রীর নাম কি?

১২। এশিয়ার কোন কোন দেশ ভারতের ন্যায় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে?

১৩। কুয়োমিনটাং কাহাকে বলে? চিয়াং কাইশেক কে?

১৪। মাও সে তুংএর বিষয় কি জান?